contents

নবী-রাসুল সিরিজ-৫

কাসাসুল কুরআন-৫

হযরত দাউদ আ.

হযরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম
হযরত হিযকিল আলাইহিস সালাম
হযরত ইলয়াস আলাইহিস সালাম
হযরত আল-ইয়াসাআ আলাইহিস সালাম
হযরত শামাবিল আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

নবী-রাসুল সিরিজ-৫

কাসাসুল কুরআন-৫

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম
হযরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম
হযরত হিযকিল আলাইহিস সালাম
হযরত ইলয়াস আলাইহিস সালাম
হযরত আল-ইয়াসাআ আলাইহিস সালাম
হযরত শামাবিল আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক

মাকতাবাতুল ইসলাম

contents

কাসাসুল কুরআন-৫

মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক

সম্পাদনা

মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১১০ [একশত দশ] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [5]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdullah Al Faruque
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 110.00
ISBN : 978-984-90977-5-4
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূ চি প ত্র

contents

contents

হযরত ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম
হযরত হিযকিল আলাইহিস সালাম
হযরত ইলয়াস আলাইহিস সালাম
হযরত আল-ইয়াসাআ আলাইহিস সালাম
হযরত শামাবিল আলাইহিস সালাম
হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম

contents

হযরত ইউশা বিন নুন
আলাইহিস সালাম

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর স্থলাভিষিক্ত

হযরত মুসা আ.-এর জীবনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, হযরত হারুন আ.-এর পর তাওরাতে দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কথা খুব বেশি আলোচনা হয়েছে, তিনি হলেন, হযরত ইউশা আ.। বিগত পৃষ্ঠাগুলোর বেশ কয়েক জায়গায় আমরা তাঁর কথা উল্লেখ করেছি। হযরত মুসা আ.-এর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর সেবক ছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত হারুন ও হযরত মুসা আলাইহিমাস সালামের ইন্তিকালের পর তিনি তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে নবুওতের মিশনের হাল ধরেন। কিনআন নগরীতে অত্যাচারী মুশরিক জাতিগুলোর অবস্থা জানতে যে-প্রতিনিধিদলটি গিয়েছিলো, তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। এরপর যখন হযরত মুসা আ. বনি ইসরাইলকে সেই জাতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান আর তারা অস্বীকার করে বসে, তখন তিনিই সেই প্রথম ব্যক্তি; যিনি বনি ইসরাইলের মনে সাহস জুগিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর সাহায্যের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিহাদের ওপর অনুপ্রাণিত করে তোলেন। তিনি তাদের বলেন, যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও তাহলে নির্ঘাত বিজয় তোমাদেরই পদচুম্বন করবে।

তাওরাতে এসেছে, হযরত মুসা আ.-এর জীবদ্দশাতেই মহান আল্লাহ তাদের সামনে এ সত্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, ইউশা আমার বিশেষ বান্দা। বনি ইসরাইলের যুবকেরা তাঁরই নেতৃত্বে কিনআন ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে অত্যাচারী মুশরিকদের হাত থেকে উদ্ধার করবে।

'খোদাওয়ান্দ মুসাকে বললেন, নুনের ছেলে ইউশাকে নিয়ে তার ওপর তোমার হাত রাখো। কেননা, তাতে রূহ আছে। তাকে আল-ইয়াযার জ্যোতিষী ও সমস্ত দলের সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের চোখের সামনে তাকে উপদেশ দাও। নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে তাদেরকে হতবাক

করে দাও। যাতে বনি ইসরাইলের সবগুলো গোষ্ঠী তার আনুগত্য করে।[১] নুনের পুত্র ইউশা বিজ্ঞতার প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ ছিলেন। কেননা, মুসা নিজ হাত তাঁর ওপর রেখেছিলেন এবং বনি ইসরাইল তার প্রতিটি নির্দেশ মান্য করতো।[২]

হযরত মুসা আ.-এর প্রয়াণের পর তারই নেতৃত্বে চল্লিশ বছর পর বনি ইসরাইল প্রজন্ম পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তিনি কিনআন, শাম ও জর্ডানের পূর্বাঞ্চল থেকে অত্যাচারী মুশরিক গোষ্ঠীগুলোর শক্তি ধূলিসাৎ করেন।

কুরআনুল কারিমে হযরত ইউশা আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা

কুরআনুল কারিমের কোথাও হযরত ইউশা আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয় নি। তবে সুরা কাহাফের দুটি স্থানে হযরত মুসা আ.-এর এক যুবক সফরসঙ্গীর কথা বলা হয়েছে। যখন তিনি হযরত খিযির আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়েছিলেন। একটি হলো, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ। আর দ্বিতীয়টি হলো, فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত উবাই বিন কা'ব রা. থেকে বর্ণিত আছে, ওই যুবক সফরসঙ্গীর নাম, ইউশা। এভাবে যেনো কুরআনুল কারিমে তার উল্লেখও রয়েছে। আহলে কিতাবগণ তাঁর নবী হওয়ার ওপর একমত। তাওরাত (প্রাচীন পুস্তকে) ইউশার কিতাবটিও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

বংশপরম্পরা

হযরত ইউশা আ. বংশীয়ভাবে বনি ইসরাইলের সন্তান। তিনি হযরত ইউসুফ আ.-এর অধস্তন পুরুষ ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর বংশপরম্পরা এভাবে বলেছেন, ইউশা বিন নুন বিন ফারাহিম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইবরাহিম আলাইহি সালাম।

---

১. গিনতি, অধ্যায় : ১২৭, আয়াত : ১৯-২০
২. ইসতিসনা, অধ্যায় : ৩৪, আয়াত : ৯

মহান আল্লাহর কুদরতের কী বিস্ময়কর দৃশ্য! যে ইউসুফের মাধ্যমে কিনআনের সত্তর সদস্য বিশিষ্ট একটি বংশ ইজ্জত-সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে কিনআন থেকে হিজরত করে মিসরে এসে থিতু হয়েছিলো, আজ তাঁরই পৌত্র ইউশার নেতৃত্বে লাখ সদস্যের এই বিশাল বংশ নিজেদের পিতৃপুরুষদের জন্মভূমি কিনআনে সেই মান-মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে, প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে প্রবেশ করছে।

ব্যাপারটি খুলে বলছি। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ হযরত ইউশা আ.-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি বনি ইসরাইলের এ কাফেলাকে নিয়ে প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হও। সেখানকার আমালিকা গোত্রসহ অন্যান্য অনাচারী গোষ্ঠীকে যুদ্ধে পরাজিত করো। আমার সাহায্য তোমার সঙ্গে থাকবে। তাওরাতের ভাষায়—

'আর খোদাওয়ান্দের বান্দা মুসার তিরোধানের পর খোদাওয়ান্দ তার সেবক নুনের ছেলে ইউশাকে বললেন, আমার বান্দা মুসা তিরোধান নিয়েছে। কাজেই এখন তুমি ওঠো এবং এ সকল লোক সঙ্গে নিয়ে সেই জর্ডানের তীরে সেই ভূখণ্ডে যাও, যা আমি তাদেরকে অর্থাৎ বনি ইসরাইলকে দেবো। যেসব স্থান তোমাদের পদতলে পতিত হবে, সে স্থানগুলো আমি তোমাদেরকে দান করলাম। যেমন আমি মুসাকেও একথা বলেছিলাম। মরুপ্রান্তর বা অরণ্যভূমি এবং লেবানন হতে আরম্ভ করে বড় ফোরাত নদী পর্যন্ত হিত্তুদের সমগ্র এলাকা এবং পশ্চিমদিকে বড় সমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হবে। তোমার জীবদ্দশায় তোমার সম্মুখে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। যেভাবে আমি মুসাকে সঙ্গ দিয়েছিলাম, তোমাকেও সঙ্গ দেবো। আমি তোমার থেকে আমার হাত গুটিয়ে নেবো না এবং তোমাকে ছেড়েও যাবো না।'[৩]

পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ

হযরত ইউশা বনি ইসরাইলকে খোদার বার্তা শোনালেন। তারা সবাই সাইনা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে কিনআন ভূমির সর্বপ্রথম নগরী 'আরিহা'-এর দিকে অগ্রসর হলেন। শত্রুপক্ষও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারাও

[৩]. ইয়াশু'-এর পুস্তিকা, অধ্যায় : ৫-১

বাইরে বেরিয়ে কঠিনভাবে মোকাবিলা করলো। অবশেষে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলো। বনি ইসরাইল অনেক বড় বিজয় লাভ করলো। ধীরে ধীরে ইউশা আ.-এর নেতৃত্বে বনি ইসরাইল লড়াই করে গোটা পবিত্র ভূমি করতলগত করলো। এভাবে অত্যাচারী শোষক মুশরিকদের হাত থেকে তা মুক্ত করে পিতৃপুরুষের জন্মভূমির ওপর নতুন করে আরেকবার দখল প্রতিষ্ঠা করলো।

তাওরাতে এসেছে যে, যখন বনি ইসরাইল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, তখন আল্লাহর নির্দেশে অঙ্গীকারের সিন্দুক (তাবুতে সাকিনাহ) তাদের সঙ্গে ছিলো। যাতে মুসার লাঠি, হারুনের জামা ও মান্না-এর চীনামাটির বাসন সংরক্ষিত ছিলো। এগুলো ছাড়াও আরো অনেকগুলো বরকতময় বস্তুও ছিলো। কেননা, মহান আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেছিলেন, 'তোমরা মান্না সংরক্ষণ করো। যেনো তোমাদের আগামী প্রজন্মও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায় যে, তোমাদের ওপর খোদার অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিলো।'

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. লিখেন, হযরত মুসা আ. বেঁচে থাকতেই পবিত্র ভূমির দখলদার অত্যাচারী শক্তিগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্য হযরত ইউশা আ.-কে সেনাপতি নির্বাচন করে বনি ইসরাইলের শাখাগোত্রগুলোকে বিভিন্ন শিবিরে ভাগ করে সেগুলোর কমান্ডারদের নামও চূড়ান্ত করেছিলেন। যার কারণে হযরত ইউশা আ.-এর ব্যাপারটি অনেকটা হযরত উসামা রা.-এর সঙ্গে মিলে যায়। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর জীবদ্দশায় শাম অভিযানের জন্য হযরত উসামা রা.-কে সেনাপতি মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন। পরবর্তীকালে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর শাসনামলে সেই উসামাবাহিনী শামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। ইতিহাসের পাতায় সেই যুদ্ধাভিযানটি পরবর্তীকালের রোম, ইরান ও ইরাক বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্থান করে নেয়।

এভাবে হযরত মুসা আ. পবিত্র ভূমির দখলদার শক্তিগুলোর মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইউশা আ.-কে সেনাপতি মনোনীত করেন এবং যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বগুলো নিজেই তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু

সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। মহান আল্লাহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত ইউশাকে নবুয়ত দান করেন। তাঁর হাত ধরেই পবিত্র ভূমি দখলদার মুশরিক শক্তিগুলোর হাত থেকে মুক্ত হয়। প্রকৃত বিচারে আরিহার সফল অভিযানটি গোটা পবিত্র ভূমি জয় ও উদ্ধারের সূচনা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছিলো।

হযরত ইউশা প্রথম 'কিস' নগরী জয় করেন। কুরআনুল কারিম নগরীটির নাম বলে নি, বরং জনপদ বলে অস্পষ্টভাবে ছেড়ে দিয়েছে। কেননা, সেই ঘটনার বৃত্তান্ত যে উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে জনপদের নাম নির্দিষ্ট করার কোনো সম্পর্ক নেই।

হাফেয ইমাদুদ্দীন রহ. বলেন, প্রণিধানযোগ্য অভিমত হলো, সেটি বাইতুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)। এটি 'আরিহা' নগরী না হওয়ার কারণ হলো, তা ইসরাইলিদের যাতায়াতের পথে পড়ে না। মহান আল্লাহ তাদের সঙ্গে এ নগরীর ব্যাপারেও অঙ্গীকার করেন নি। তাঁর প্রতিশ্রুত নগরী ছিলো বাইতুল মুকাদ্দাস।

কিন্তু আমাদের অভিমত হলো, قرية (জনপদ) বলে বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য; তার কথা অন্তত এতটুকু ঠিক। কিন্তু পরবর্তী বিষয়াবলির ক্ষেত্রে তিনি যেসব দলিল-উপাত্ত পেশ করেছেন, সেগুলো সঠিক নয়। কেননা, এ বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বনি ইসরাইল যদি সাইনা উপত্যকা থেকে সরাসরি বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে যাত্রা করেও থাকে, তাহলেও শুষ্কপথে তাদের যাত্রাপথে কিনআন ভূখণ্ড অবশ্যই পড়বে। যার প্রথম নগরী হলো 'আরিহা'। আপনি যদি পৃথিবীর মানচিত্র চোখের সামনে তুলে ধরেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, শুষ্কপথে ওই আদিম যুগে সাইনা উপত্যকা পেরিয়ে কেউ যদি জেরুজালেম যেতে উদ্যত হতো, তাহলে তাকে অবশ্যই কিনআন হয়ে পথ ধরতে হতো। উপরন্তু ইসরাইলিদের সঙ্গে মহান খোদার এ অঙ্গীকারও ছিলো যে, তিনি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষের ভূখণ্ড ফিরিয়ে দেবেন। আর স্পষ্ট কথা হলো, তাদের পিতৃপুরুষদের মাতৃভূমি শুধু বাইতুল মুকাদ্দাসই নয়, বরং কিনআন ভূখণ্ডও তার অন্তর্ভুক্ত। যেখান থেকে হিজরত করে হযরত ইউসুফ আ.-এর যুগে ইসরাইলিরা মিসরে এসে থিতু হয়েছিলো। কাজেই ইবনে কাসিরের পেশ

করা দলিল দুটি দুর্বল ও বাস্তবতা বিবর্জিত। অবশ্য জনপদ বলে বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য নেয়াটা সঠিক হওয়ার কারণ হলো, মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইউশা আ.-এর নেতৃত্বে 'আরিহা'-তে প্রথম আমালিকা গোষ্ঠীকে পরাজিত করে। এরপর কিনআন নগরী পদানত করে অবশেষে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়। যার অব্যবহিত পরে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসও জয় করে ফেলে। যেহেতু এ স্থানটি ছিলো তাদের তাবৎ বিজয়াভিযানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ও চূড়ান্ত লক্ষ্য; এ কারণে সেটি বিজিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ তাদেরকে এই সুবিশাল সাফল্যের প্রেক্ষিতে সেই নির্দেশ প্রদান করেন, যার কথা কুরআনুল কারিমে উঠে এসেছে।

অকৃতজ্ঞতা

কুরআনুল কারিমে এসেছে, যখন মহান আল্লাহ বনি ইসরাইলকে বিজয় দান করেন এবং তারা বিজয়ীবেশে শহরের ভেতর প্রবেশ করতে শুরু করে তখন তিনি তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা অহঙ্কারী ও আত্মম্ভরী লোকদের মতো প্রবেশ করবে না; বরং খোদার শোকর আদায়কারীদের মতো মহান আল্লাহর দরবারে বিনম্রতার সঙ্গে নতশীর হয়ে ও তওবা-ইসতিগফার করা অবস্থায় প্রবেশ করবে। যাতে আল্লাহর শোকরগোযার বান্দা ও অহঙ্কারী-উদ্ধত শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বিজয় ও সাহায্যপ্রাপ্ত হতেই ইসরাইলিদের সেই মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য ফিরে আসে। তারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতা করে অহঙ্কারী ও উদ্ধত মানুষদের মতো জনপদে প্রবেশ করে। তারা সদর্প পদক্ষেপে মাথা উঁচু রেখে অহমিকা দেখিয়ে পথ চলছিলো। ইসতিগফার ও প্রার্থনার স্থলে অহঙ্কারী শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিলো। যেনো তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সঙ্গে বিদ্রূপ করা অবস্থায় শহরে প্রবেশ করছিলো। তার উপর্যুপরি অবাধ্যতার ফলে অবশেষে মহান আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। ক্রমাগত নিন্দিত বদ আমলের প্রতিফল স্বরূপ তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে।

কুরআনুল কারিমের দুটি স্থানে এই ঘটনা আলোচিত হয়েছে। প্রথমটিতে সংক্ষেপে ও দ্বিতীয়টিতে খানিকটা বিশদভাবে তার আলোচনা হয়েছে। সুরা বাকারা ও সুরা আ'রাফে ইরশাদ হয়েছে—

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

'স্মরণ করো, যখন আমি বললাম, 'এ জনপদে প্রবেশ করো। যেথা ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে আহার করো, নতশীরে প্রবেশ করো ফটক দিয়ে এবং বলো, 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করবো। কিন্তু যারা অন্যায় করেছিলো তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো তার পরিবর্তে অন্য কথা বললো। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিলো।' [সুরা বাকারা: আয়াত ৫৯-৬০]

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

'স্মরণ করো, তাদেরকে বলা হয়েছিলো, 'তোমরা এ জনপদে বাস করো ও যেথা ইচ্ছে আহার করো এবং বলো, 'ক্ষমা চাই' আর নতশীরে দ্বারে প্রবেশ করো; আমি তোমাদের অপরাধ মার্জনা করবো। আমি সৎকর্মশীলদেরকে আরো অধিক দান করবো। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিলো, তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো। সুতরাং আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘন করছিলো।' [সুরা আরাফ: আয়াত ১৬১-১৬২]

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে حِطَّةٌ শব্দ এসেছে। এখানে দুটি প্রশ্ন। ১. উল্লিখিত শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ২. বনি ইসরাইল এ শব্দের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন করেছিলো?

এ দুটি প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, أي مغفرة استغفروا। হযরত কাতাদা রহ. বলেন, احطط عنا خطايانا। উভয়ের বক্তব্যের সারাংশ হলো, তোমরা এ কথা বলা অবস্থায় প্রবেশ করো যে, 'হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের ভুলগুলো নিশ্চিত করে দিন।' বলা যেতে পারে حِطَّةٌ শব্দটি হলো সেই বড় বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেভাবে بسم الله الرحمن الرحيم [বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম]-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো بسملة [বাসমালা] এবং لا حول ولا قوة إلا بالله [লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি]-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো, حوقلة [হাওকালা]। لا إله إلا الله [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু]-এর সংক্ষিপ্ত রূপ هلهلة [হালহালা]। বুখারি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বনি ইসরাইলরা তখন حِطَّةٌ শব্দের স্থলে حبة في شعرة [হাবাতুন ফী শা'রাতিন] বলা শুরু করেছিলো। অর্থাৎ তারা বলছিলো, 'চুলের ভেতর সংরক্ষিত দানা আমাদের চাই।' এভাবে তারা মহান আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে বিদ্রূপ করতে লাগলো। সেজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ না করে নিতম্বের ওপর হেঁচড়ে পথ চলছিলো। বর্ণনায় এ শব্দ এসেছে, يزحفون على استارهم।

বুখারি শরিফের উল্লিখিত বাক্যের সাধারণত এ ব্যাখ্যা বুঝা হয়ে থাকে যে, বনি ইসরাইলিরা নিতম্বের ওপর হেঁচড়ে চলছিলো। কিন্তু এমতবস্থায় একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, উদ্ধত ও আত্মম্ভরী ঢঙে পথচলার এই পদ্ধতি কোথাও প্রচলিত নেই এবং এটি যৌক্তিকও নয়। এর মাধ্যমে খোদ নিজেকেই বিদ্রূপের পাত্র বানানো হয়। এভাবে তো অন্যের সঙ্গে বিদ্রূপ করা হয় না। কাজেই হাদিসের উল্লিখিত বাক্যের সঠিক তাফসির হলো সেটাই যা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, বনি ইসরাইলিরা নগরীতে প্রবেশ করার সময় মাথা অবনত না রেখে সদর্পে মাথা উঁচু রেখে পথ চলছিলো। অর্থাৎ, যেভাবে একজন অহঙ্কারী মানুষ সদর্পে পথ চলার সময় নিতম্ব নাচিয়ে বিশেষ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করে ঠিক তাদের মতোই বনি ইসরাইলিরা নিতম্বদেশ উত্থিত করে তার ওপর হেঁচড়ানোর মতো করে নগরীতে প্রবেশ করছিলো।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাঁর সৎ ও ইবাদতগুযার বান্দাদের সঙ্গে অহঙ্কারী-উদ্ধত মানুষদের কী পার্থক্য তা জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, যারা আল্লাহর অনুগত বিনম্র বান্দা হন, তারা করা সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত বড়ত্ব অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে লড়াই করেন না, বরং আল্লাহর শত্রু, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, সমাজে অস্থিতিশীলতা তৈরিকারী মহলের অনিষ্টতা এবং অত্যচারী, অবিচারী জাতিগোষ্ঠীর অত্যাচার-অনাচার দূরীভূত করার লক্ষ্যে লড়াই করে থাকেন এজন্য যে, এর দ্বারা সাম্য ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁরা এ বিশ্বাস নিয়েই অস্ত্র ধারণ করে থাকেন যে, الفتنة أشدّ من القتل : ফেতনা ও বিপর্যয় হত্যা থেকেও গুরুতর অপরাধ। এ কারণে যখন তাঁরা কাফেরদের ওপর বিজয়ী হন, তখন তাঁরা নিজেদের আনন্দের প্রকাশ অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার মাধ্যমে করেন না, বরং এ সময় তাঁরা আল্লাহর সমীপে চূড়ান্ত বিনম্রতা ও আত্মতুচ্ছতার সঙ্গে সেজদাবনত হয়ে তাঁদের আনন্দের প্রকাশ ঘটান। যখন তারা বিজিত এলাকাসমূহে প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেকে পরিপূর্ণ শোকরগুজার বিনম্র বান্দার বেশে প্রবেশ করেন। তাইতো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা নগরীকে কাফেরদের হাত থেকে পবিত্র করে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করেন তখন তিনি এতটাই বিনীত ও বিনম্র ছিলেন যে, উটের ওপর আরোহণ করা অবস্থায় তিনি খুব বেশি মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য হলো, এসময় নবীজির দাড়ি মুবারক উটের হাওদার মাথা ছুঁই ছুঁই করছিলো। এরপর যখন নবীজি হেরেম শরিফে প্রবেশ করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হয়ে পড়েন এবং আট রাকাত শোকরিয়ার নামায আদায় করেন।

সাহাবায়ে কেরামের চিত্রও ছিলো অনুরূপ। হযরত উমর রা.-এর হাতে যখন বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত হয়, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর হাতে যখন ইরান পদানত হয়, তখন এই মহান বিজয়ীগণ বিজিত এলাকাসমূহে অপরাপর অহঙ্কারী রাজাদের মতো সদর্পে প্রবেশ করেন নি, বরং আল্লাহর একজন বিনীত, ভগ্নহৃদয় ও অনুগত বান্দার মতো বেশে

তারা প্রবেশ করেছিলেন। যখন হযরত উমর রা. বাইতুল মুকাদ্দাসের হেরেমে প্রবেশ করেন এবং যখন হযরত সা'দ রা. কিসরার রাজপ্রাসাদে ঢোকেন, তখন তাঁরা প্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো, তাঁরা মহান আল্লাহর সমীপে মাথা নত করে শোকরিয়ার নামায আদায় করেন। এভাবে তাঁরা তাঁদের দাসত্ব, অক্ষমতা ও আনুগত্যের ব্যবহারিক স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলেন। তাঁদের চিত্র ছিলো এমন যে, তাঁরা যখন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, তখন বীরত্ব ও শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন আর যখন বিজয়ী হতেন তখন নীচতা, অক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর শোকর আদায় করতেন। এসময় তাঁরা বিজিত অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে একান্ত দয়ালু আচরণ করতেন।

মোটকথা, অবশেষে ইসরাইলি সম্প্রদায় তাদের কৃতকর্মের দণ্ড ভোগ করে। তারা আল্লাহর শাস্তির পাত্রে পরিণত হয়। প্রশ্ন হলো, আল্লাহর ওই শাস্তি কী ছিলো? কুরআনুল কারিম এর কোনো বিশদ ব্যাখ্যা দেয় নি। শুধু رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ : 'আকাশ হতে শাস্তি' বলে বিষয়টিকে অস্পষ্ট আকারে ছেড়ে দিয়েছে। আর বাস্তবতা হলো, তাদের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নিতে হলে এতটুকুই যথেষ্ট।

সুরা আ'রাফে এসেছে, فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : 'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিলো, তাদেরকে যা বলা হয়েছিলো, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো।' যা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার এই ঘৃণিত কাজ বনি ইসরাইলের সব লোক করে নি। বরং সেই সম্প্রদায়ে একটি দল এমনও ছিলো, যারা সবসময় আল্লাহর নির্দেশের অনুগত থেকেছে এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে হযরত ইউশা আ.-কে সঙ্গ দিয়েছে।

শিক্ষা ও উপদেশ

১। হযরত ইউশা আ. ও বনি ইসরাইলের উল্লিখিত ঘটনাপ্রবাহ থেকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উপলব্ধ হয় তা হলো, একজন মানুষের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব হলো, যখন সে কোনো বিপদ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে বা

সাফল্যের সঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবে, তখন সে যেনো আত্মম্ভরিতা ও দর্পের জালে ফেঁসে এ কথা না বুঝে বসে যে, এটি আমার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার ফসল। বরং এ সময় তার দায়িত্ব হলো, সে মহান আল্লাহর শোকরগুজার হয়ে থাকবে, নিজের অক্ষমতার স্বীকারোক্তি জানিয়ে তাঁরই সামনে বিনীত হয়ে মাথা নত করবে, যাতে সে আগামীতেও সেই মহান সত্তার করুণার আঁচলে বাঁধা থাকে এবং দুনিয়ার মতো আখেরাতেও সফলতা লাভ করে চিরধন্য হতে সক্ষম হয়।

২। চরম থেকে চরমতর হতাশাজনক অবস্থাতেও কোনো ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হওয়া যাবে না। কেননা, একজন ব্যক্তি যদি নিপীড়িতও হয়, অত্যাচারের যাঁতাকলে প্রতিনিয়ত পিষ্টও হয়, তারপরও সে মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। তবে সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী কর্মকৌশল ও কল্যাণকামনার প্রেক্ষিতে সেটি আসতে অবশ্যই বিলম্ব হয়ে থাকে।

৩। যে-জাতির ওপর আল্লাহর দয়া, করুণা, অনুগ্রহ ও পুরস্কার অবারিত হয়ে বর্ষিত হতে থাকে যদি তারা কৃতজ্ঞ ও অনুগত না হয়ে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তাহলে সেই জাতির লোকদেরকে অতিদ্রুত মহান সত্তার কঠিন শাস্তি ও চরম জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, তারা এতকিছু দেখার পর এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করার পরও অবাধ্যতার শিকার হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে চরম অন্যায় ও কঠিন দণ্ডনীয় অপরাধ।

contents

হযরত হিযকিল

আলাইহিস সালাম

ভূমিকা

হযরত মুসা আ.-এর পর বনি ইসরাইলে যেসকল মহান নবী প্রেরিত হয়েছেন, তাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সেই তালিকার সর্বশেষ সংযোজন হলেন হযরত ঈসা আ.। কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমায় ঠিক কতজন নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছিলেন, তার সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআনুল কারিমে এই তালিকার অল্প কয়েকজনের কথা আলোচিত হয়েছে। কারো কথা বিস্তারিতভাবে এসেছে। কারো কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। আর কারো শুধু নামই উচ্চারিত হয়েছে। কুরআনুল কারিমে যেসকল নবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার বাইরে আরো কয়েকজন নবীর কথা তাওরাতে উল্লেখ করা আছে। সে সঙ্গে তাদের ঘটনাবলি ও বৃত্তান্তও সংযোজিত রয়েছে।

ইসরাইলি নবীদের মধ্যে ঐতিহাসিক ক্রমবিন্যাস একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন। তবে আমরা এক্ষেত্রে ইবনে জারির, তাবারি ও ইবনে কাসির রহ.-এর বিন্যাসকে প্রণিধানযোগ্য মনে করি। এ-কারণে তাঁদের বর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে ওই সকল নবীর জীবনী পেশ করেছি।

হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহিমাস সালামের পর তাওরাত ও ইতিহাসের অভিন্ন রায় অনুযায়ী হযরত ইউশা আ. নবুওতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হযরত মুসা আ.-এর অপর সঙ্গী কালিব ইবনে ইউহান্না। যিনি সম্পর্কে হযরত মুসা আ.-এর সহোদরা হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরানের স্বামী ছিলেন। তবে তিনি নবী ছিলেন না।[১]

তাবারি রহ. বলেন, তাঁর তিরোধানের পর প্রথম যে-মহান ব্যক্তিত্ব বনি ইসরাইলের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন, তিনি হলেন, হযরত হিযকিল আ.।

---

৪. তারিখে ইবনে কাসির : ২/২

নাম, বংশ ও নবুয়ত লাভ

তাওরাতের তথ্যমতে, তিনি ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতিষী বুযির পুত্র। তাঁর নাম, হিযকি-ইল।[১] ইবরানি ভাষায় 'ইল' একটি বড়ত্ববোধক শব্দ। আর 'হিযকি' শব্দের অর্থ শক্তি ও বল। এ কারণে আরবি ভাষায় সংযুক্ত নামের অর্থ করা হয়, আল্লাহর শক্তি। কথিত আছে যে, হযরত হিযকিল আ.-এর পিতা তার শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর নবুয়ত লাভের সময় অত্যাসন্ন, তখন হযরত হিযকিল আ.-এর মাতাও বয়োবৃদ্ধ হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন। এ কারণে ইসরাইলিদের মধ্যে তিনি 'ইবনুল 'আজুয' উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২]

হযরত হিযকিল আ. দীর্ঘকাল বনি ইসরাইলের মধ্যে তাবলিগে দীন ও তাদের ইহকালীন ও পরকালীন পথপ্রদর্শনের মহান কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

কুরআনুল কারিমে হযরত হিযকিল আ.-এর আলোচনা

কুরআনুল কারিমের কোথাও হযরত হিযকিল আ.-এর নামের উল্লেখ নেই। তবে সুরা বাকারায় উল্লেখিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহান বুযুর্গানে দীন থেকে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার থেকে অনুমিত হয় যে, ওই ঘটনা হযরত হিযকিল আ.-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

তাফসিরের বিভিন্ন কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবাস রা.-সহ অন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ কথা বর্ণিত রয়েছে যে, যখন বনি ইসরাইলের অনেক বড় একটি দলের উদ্দেশে তাদের বাদশাহ বা তাদের নবী হযরত হিযকিল আ. এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, অমুক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং আল্লাহর পতাকা উড্ডীন রাখার দায়িত্ব পালন করো। তখন তারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় তারা মনে করেছিলো যে, আমরা জিহাদ থেকে পালানোর মাধ্যমে মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছি। তারা অনেক দূরের একটি উপত্যকায় আত্মগোপন করে।

---

[১]. হিযকি এল শব্দটি বনি ইসরাইলের সমাজে একজন জ্যোতিষী, প্রাজ্ঞ জ্ঞানী ও পরিপূর্ণতার অধিকারী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অর্থে ব্যবহৃত হতো।

[২]. যার অর্থ, বয়োবৃদ্ধের সন্তান।

তখন হয়তো হযরত হিযকিল আ. তাদের এই পলায়নকে আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্যতা এবং তাকদিরের অমোচনীয় সিদ্ধান্তের প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শন মনে করে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছিলেন অথবা খোদ আল্লাহর কাছে তাদের এই কর্মকাণ্ড অসন্তুষ্টির কারণ হয়, ফলে গযব নেমে আসে। যাইহোক, সেই গযবের ফলে তাদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একসঙ্গে সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এক সপ্তাহ পর যখন হযরত হিযকিল আ. তাদের পাশ দিয়ে গমন করেন তখন তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে আফসোস প্রকাশ করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন যে, হে উভয় জাহানের প্রতিপালক, আপনি ওদেরকে মৃত্যুর আযাব থেকে মুক্তি দান করুন, যাতে তাদের জীবন তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও চরম শিক্ষা ও উপদেশের উপলক্ষ হয়। নবীর দোয়া গৃহীত হয়। তারা নতুন জীবন লাভ করে। এভাবে তাদের নবজীবন হয় সকলের জন্য উপদেশ ও শিক্ষার জীবন্ত উপকরণ।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে এসেছে যে, সেই ইসরাইলি জনগোষ্ঠীটি ছিলো 'দাদরাওয়ান' অঞ্চলের বাসিন্দা। এটি ভূমধ্যসাগর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। ওই লোকগুলো ওখান থেকে পালিয়ে 'উনাইহ' উপত্যকায় আত্মগোপন করেছিলো। সেখানেই তাদের ওপর মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে এসেছিলো।

কুরআনুল কারিমে সেই ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ()

'তুমি কি তাদেরকে দেখো নি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে তাদের আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিলো, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৩]

জিহাদ থেকে পলায়ন

মুহাম্মদি শরিয়তের বিধানমতে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন (মহান আল্লাহর সঙ্গে শিরকের পর) সবচেয়ে বড় গুনাহ। বাস্তবতাও এ কথাই বলে। কেননা, একজন মানুষ যখন আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তখন সে তার জান-মাল সবকিছুই তাঁর কাছে সোপর্দ করে দেয়। এই সোপর্দ করার নামই তো হলো ইসলাম। কাজেই এখন তো এক মুহূর্তের জন্যও সে এ সুযোগ পেতে পারে না যে, সেই আল্লাহর নির্দেশের বাইরে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর ফন্দি খুঁজবে। কাপুরুষতা ও পলায়নপরতা ইসলামের সঙ্গে মানায় না। সত্যের পথে বীরত্ব প্রদর্শনই ইসলামের স্বতন্ত্র প্রতীক।

একজন মানুষের হৃদয়ে যখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, ভালো ও মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের সবটাই গোটা বিশ্বনিখিলের একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহর কুদরতি হাতে। তিনি ভাগ্যলিপিতে যা লিখেছেন তা ই ঘটবে। এর অন্যথা হতে পারে না, তখন তো এক মুহূর্তের জন্যও তার মনোজগতে এ ভাবনা উঁকি দিতে পারে না যে, সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যলিখন সম্পর্কে এ ধারণা করবে যে, আমার কৌশলী সিদ্ধান্ত আল্লাহর ফয়সালার গতিপথ বদলে দিতে পারে! সে তো এ ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, এক স্থানে তাঁর তাকদির কার্যকর হলে অন্য স্থানে সেটি কোনোরূপ প্রভাব ফেলবে না।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তাকদির-সম্পর্কিত দর্শন হলো, ব্যক্তি নিজের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করবে যে, আমার দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা। এখন যদি কোথাও এ আশঙ্কা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর কোনো বিধান বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রাণহানি হতে পারে অথবা সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে তাহলে সে দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করবে যে, এটি আমার ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয়। যদি মহান আল্লাহর কুদরত কারো জান বা মাল ধ্বংস হওয়ার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে কোনো না কোনো কার্যকারণ সৃষ্টি হয়ে এই সৃষ্টজগতে সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত করে দেখাবে। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিকে বীর-বাহাদুর বানিয়ে দেয়

এবং কাপুরুষতা ও বিহ্বলতা থেকে দূরে রাখে। তার দৃষ্টি একমাত্র দায়িত্ব পালনের ওপরই নিবদ্ধ থাকে। সে কুদরতি সিদ্ধান্তগুলোকে নিজের কর্মক্ষমতার উর্ধ্বে মনে করে এড়িয়ে চলে।

ইসলাম কখনো তাকদিরের এ অর্থ বলেনি যে, হাত-পা মুড়ে, চেষ্টা-সাধনা ও কর্মঘনিষ্ঠ জীবন ছেড়ে গায়বি সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকবে এবং 'কুদরতি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হবে' এ কথা ভেবে নিজ দায়িত্ব পালন ছেড়ে দেবে। প্রকৃতপক্ষে কাপুরুষতা ও পৌরুষহীনতা থেকেই এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হয়। যা ব্যক্তিকে তার দায়িত্বপালনে বাধা দেয় এবং ঝুট-ঝামেলাহীন জীবনের দিকে আহান করে লাঞ্ছনার গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

জিহাদের আয়াত থেকে বর্ণনার সমর্থন

উল্লিখিত আয়াতের পরবর্তী আয়াতে জিহাদের আলোচনা এসেছে। যা 'জিহাদের আয়াত' নামে প্রসিদ্ধ। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় যে বর্ণনাটি পেশ করা হয়েছে, পরবর্তী জিহাদের আয়াতে তার সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে মুসলমানদেরকে জিহাদের ওপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে— وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ 'আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো।' যেহেতু জিহাদের জন্য প্রয়োজন আত্মোৎসর্গী মনোভাব ও জগৎকে তুচ্ছ ভেবে মৃত্যুর ভয়মুক্ত হৃদয়, কাজেই সঙ্গত কারণেই তার পূর্বে বনি ইসরাইলের এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে জিহাদের ভয়ে পলায়নকারীদের ওপর মৃত্যুর আযাব নেমে আসার ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাতে ওই ঘটনা থেকে পাঠক উপদেশ গ্রহণ করে, তার হৃদয়ে বীরত্ব ও পৌরুষোদ্দীপ্ত চেতনা সৃষ্টি হয় এবং কাপুরুষতা ও বিহ্বলতার প্রতি ঘৃণা জন্মে।

মৃত ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মাযহাব অনুসারে আমরা আমাদের উল্লিখিত আলোচনা পেশ করেছি।

ইবনে কাসির রহ. বলেন, মৃত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবনের ঘটনাটি ওই সকল লোককে শিক্ষা দেয়ার জন্য ঘটেছিলো যারা কিয়ামতের দিন মৃতদেহের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। কেননা, বনি ইসরাইলের মধ্যে এমন একদল মুশরিকও ছিলো, যারা মৃতদেহের পুনরুত্থানকে মেনে নিতে পারতো না।

যদিও আমরা ইতোপূর্বে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি, তারপরও এখানে কিছুটা খোলাসা করার প্রয়োজন বোধ করছি। আধ্যাত্মিকতা (Spiritualism) বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, 'রূহ' দেহ থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। একটি দেহ যদি পচে-গলেও যায় এবং তার উপাদানগত সংযুক্ত কাঠামো যদি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়েও যায়, তারপরও রূহ জীবিত থাকে। দ্বিতীয়ত, এ বিষয় অবশ্যই যৌক্তিক যে, যে মহান সত্তা কোনো বস্তুকে সংযুক্ত কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সংযুক্ত কাঠামো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাকে দ্বিতীয়বার সংযুক্ত করতে সক্ষম। কাজেই রূহের জীবিত থাকা এবং দেহের সংযুক্ত কাঠামোর অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় যুক্ত হওয়ার বিষয়টি যখন যুক্তিসম্মত, তখন মৃতদেহের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। তা কখনো কখনো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নবী-রাসুলদের বক্তব্য সত্য প্রমাণিত করার প্রয়োজনে, তাদের আহ্বানের সমর্থনে এই দুনিয়াতেও মুজেযা আকারে সংঘটিত হয়।

এখানে কারো কারো মনে এ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, পার্থিব জীবনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বার জীবন পেতে পারে না এবং কিয়ামত দিবসেই মৃতদেহের পুনরুত্থানের ঘটনাটি ঘটবে। তাহলে কী করে বনি ইসরাইলের ওই বিশেষ দলটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলো? যারা এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড অধ্যয়ন করেছেন, তারা অবশ্যই সেখানে উত্তর পেয়ে গেছেন যে, কখনো কখনো বিশেষ আইন অনুযায়ী কোনো প্রয়োজন ও প্রজ্ঞানির্ভর কৌশলী সিদ্ধান্তমতে এ জাতীয় ব্যত্যয় সংঘটিত হওয়া যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু সম্ভবই নয়, বরং ঘটেছেও।

যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের বিপরীতে প্রখ্যাত তাবেঈ মুফাসসির ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, উল্লিখিত আয়াতসমূহে যা কিছু বলা হয়েছে তা একটি تمثيل বা উপমার প্রয়োগমাত্র। তা জিহাদ থেকে পলায়নকারীদেরকে উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কুরআনুল কারিমে

বলা হয়েছে। এটি কোনো সত্যিকার ঘটনার উল্লেখ নয়। বনি ইসরাইলের প্রাগৈতিহাসিক যুগে এমন কিছু ঘটে নি।

আমাদের মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতই সঠিক। কেননা, কুরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলী থেকে জানা যায় যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত তালাকের কিছু বিধান বলা হয়েছে। তাতে জিহাদের সামান্যতম উল্লেখও নেই। অবশ্য সেই আয়াতসমূহের পরে জিহাদের আলোচনা এসেছে। যদি উল্লিখিত আয়াতসমূহ 'জিহাদ'-এর প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই উপমাস্বরূপ পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে আরবি সাহিত্যের স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী দরকার ছিলো, প্রথমে জিহাদের বিধান বলা। এরপর যারা জিহাদকে ভয় পায় সেই পলায়নপর মনোবৃত্তির লোকদের উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার জন্য উপমার দৃশ্যায়ন করে এই সত্যের উদ্‌ঘাটন করা যে, জিহাদ থেকে পলায়নকারীদের পুনরুত্থান মন্দভাবে হয়। কিন্তু এখানে এর উল্টো ঘটেছে। অর্থাৎ প্রথমে ঘটনার দৃশ্যায়ন ঘটেছে, এরপর জিহাদের আয়াত এসেছে।

কাজেই সঠিক ব্যাখ্যা হলো, যখন জিহাদের দিকে কথার মোড় ঘুরতে শুরু করেছে, তখন তার পূর্বেই বনি ইসরাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রাচীন যুগের একটি জাতি জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে আল্লাহর শাস্তির পাত্র হয়েছিলো। আর তারপরই কুরআনুল কারিমের পাঠকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এই পদ্ধতিতে আলোচনা পেশ করার একটি কার্যকর মানসিক প্রভাব রয়েছে। তা হলো, এর ফলে সেই নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের চরম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় একজন মানুষের হৃদয়াকাশে কুমন্ত্রণা, সংশয় ও জীবন বাঁচানোর যে ভাবনা উঁকি দিতে শুরু করে তা মুহূর্তেই সেই সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি থেকে দূর হয়ে যায়। তখন সে নিজেকে সত্যের পথে উৎসর্গ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়।

উপদেশ ও শিক্ষা

হযরত হিযকিল আ. ও বনি ইসরাইল-সম্পর্কিত উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে যে শিক্ষা ও উপদেশ অর্জিত হয়, যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই এ আহ্বান, তা নিম্নরূপ :

১. ব্যক্তির মানসিকতা যদি সুস্থ হয়, তার প্রকৃতি যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়, তাহলে তার হেদায়েত ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য শুধু একটি বার চিন্তা-ভাবনাকে বাস্তবমুখী করে দেয়াই যথেষ্ঠ। তখন তার মনুষ্যত্ব নিজ থেকেই সরল পথের পথিক হয়ে যাবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যের খোঁজ পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি বাইরের বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে মানবপ্রকৃতিতে বক্রতা এবং মানসিকতায় অসুস্থতা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাকে সুস্থ করার জন্য, বক্রতাকে দূর করার জন্য বারবার আল্লাহর আহ্বান এসে তাকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু প্রতিটি বার দেখা যাবে যে, তার যোগ্যতা ও সক্ষমতার শক্তি পূর্বাপেক্ষা নিস্তেজ হতে চলেছে। বরং সে আগের চেয়েও অধিকতর গাফলতির শিকার হয়ে পড়ে। এভাবে একসময় তার শক্তি ও যোগ্যতা পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর ওই লোক যখন ওই স্তরে নেমে যায়, যার কথা কুরআনুল কারিম এভাবে বর্ণনা করেছে— خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ : 'আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর আবরণ রয়েছে।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৭] তখন তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। সে চিরদিনের জন্য তার গযব ও ক্রোধের পাত্র হয়ে যায়। তার উদ্দেশে তখন নিম্নের এই ঘোষণা উচ্চারিত হয়— وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ: 'তারা লাঞ্ছনা- ও দরিদ্রতাগ্রস্ত হলো এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হলো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৬১]

বনি ইসরাইলের ক্রমাগত অবাধ্যতা এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে নিয়মিত বিদ্রোহ তাদের বক্রতাকে দ্বিতীয় পথে ফেলে দিয়েছিলো। হযরত হিযকিল আ.-এর যুগেও তারা তাদের মন্দপথের পথচলা পূর্ণ করতেই ব্যস্ত ছিলো। তা সত্ত্বেও তাদের খুবই ক্ষুদ্র একটি দল নবী-রাসুলদের দেখানো পথের যাত্রী হয়ে সত্য ও হেদায়েতের সামনে অবনত মস্তক ছিলো। পথে বিভিন্ন বিচ্যুতি ও পদস্খলন সত্ত্বেও তারা কোনোমতে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অবস্থান করছিলো।

২। জিহাদ যদিও জাতির কিছু সদস্যের জন্য মৃত্যুপরোয়ানা হয়ে তাদেরকে পার্থিব বিভিন্ন স্বাদ থেকে বঞ্চিত করে দেয় কিন্তু তা জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্জীবনী সুধা হয়ে ওঠে। জাতীয়তা ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার এটাই একমাত্র রক্ষাকবচ। সঙ্গে সঙ্গে যারা মৃত্যুর কোলে

ঢলে পড়ে, তাদের জন্য জিহাদ হলো ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে চিরসবুজ ও শাশ্বত সুখময় জীবনপ্রাপ্তির একমাত্র ফটক। এটিই মৃত্যুর সেই দর্শন, যা মুসলমানদের জীবনকে অন্য জাতিদের থেকে এমনভাবে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে যে, আল্লাহর পতাকা সমুন্নতকারী মানুষ যদি পার্থিব জীবনে সফল থাকে তাহলে সে হয় বীর গাজি ও মুজাহিদ। আর যদি মৃত্যুর সুধা পান করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার নাম লেখা হয় মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের তালিকায়। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ○

'আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।' [সুরা বাকারা : আয়াত ১৫৪]

আর সে কারণেই যারা জিহাদের জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায়, তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নের ক্রোধবার্তা উচ্চারিত হয়েছে—

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

'সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান গ্রহণ ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে। তার শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। যা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।' [সুরা আনফাল : আয়াত ১৬]

৩। ইসলাম বীরত্বকে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ও কাপুরুষতাকে নিন্দনীয় স্বভাব গণ্য করে। একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পাপাচারের তালিকা পেশ করে ইরশাদ করেছেন, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভুলক্রমে এসব পাপাচার ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই কাপুরুষতা একত্র হতে পারে না। কিন্তু মনে রাখবে, কারো ওপর অন্যায়ভাবে শক্তি প্রদর্শন করাকে বীরত্ব বলে না। বরং সত্যের ওপর অবিচল থাকা এবং বাতিল থেকে নির্ভয় হওয়ার নামই হলো বীরত্ব।

হযরত ইল্‌য়াস
আলাইহিস সালাম

ভূমিকা

ইতোপূর্বে আমরা এ আলোচনা করেছি যে, হযরত মুসা ও হারুন আ.-এর মৃত্যুর পর যেসকল ব্যক্তি প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নাম কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয় নি। হযরত ইউশা আ.-এর কথা দুটি স্থানে এসেছে। তবে এক স্থানে তাকে স্মরণ করা হয়েছে فتى শব্দে অর্থাৎ মুসার সঙ্গী বলে। আর অপর স্থান অর্থাৎ সুরা মায়েদায় হযরত উইশা আ. ও কালেব ইবনে ইউহান্না-এর আলোচনা হয়েছে رجلان [দুই ব্যক্তি] শব্দে। আর হযরত হিযকিল আ.-এর কথা উঠে এসেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের মতে শুধু একটি ঘটনায়। অন্যথায় আয়াতে কারিমায় কোনো বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত অবস্থাতেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় না। হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের পরবর্তী নবী-রাসুলদের মধ্যে কুরআনুল কারিমে প্রথম যাঁর নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি হলেন হযরত ইলয়াস আ.। যিনি ছিলেন হযরত হিযকিল আ.-এর স্থলাভিষিক্ত। বনি ইসরাইলের মধ্যে তিনি 'ইলইয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

নাম

কুরআনুল কারিমে তাঁর নাম বলা হয়েছে, ইলয়াস। ইউহান্নার ইঞ্জিলে তাঁকে 'ইলইয়াহ' নবী বলা হয়েছে। কিছু কিছু রেওয়ায়েতে এসেছে যে, ইলয়াস ও ইদরিস একজন নবীরই ভিন্ন দুটি নাম। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, প্রথমত সেই রেওয়ায়েতেগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনে কেরামের আপত্তি রয়েছে। তারা সেগুলোকে প্রমাণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন।[১]

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১/২৩৭-২৩৯

দ্বিতীয়ত, কুরআনুল কারিমের আলোচনার পদ্ধতি থেকেও রেওয়ায়েতগুলোর প্রত্যাখ্যান পাওয়া যায়। এভাবে যে, কুরআনুল কারিম সুরা আনআম ও সুরা আস-সাফ্‌ফাতে হযরত ইলয়াস আ.-এর যে গুণাবলি ও বৃত্তান্ত প্রদান করেছে, সেগুলোর কোথাও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, তাঁকে ইদরিসও বলা হয়। সুরা আম্বিয়ার যে আয়াতে হযরত ইদরিস আ.-এর আলোচনা এসেছে, সেখানেও এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যার দ্বারা এই দুই নবীর গুণাবলি ও বৃত্তান্তের সামঞ্জস্যের প্রমাণ উপস্থিত। কাজেই এই ভিন্ন দুই বৃত্তান্তকে অভিন্ন এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত মনে করার সুযোগ নেই।

এছাড়াও ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে এই দুই মহান নবীর যে বংশপরিক্রমা পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার ভিত্তিতে তাদের দুজনের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর দূরত্ব পরিলক্ষিত হয়। কাজেই এই দুটি নাম যদি একই নবীর হতো তাহলে কুরআনুল কারিম অবশ্যই এদিকে ইশারা করতো এবং ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই কোনো-না-কোনো দলিলের আলোকে এই দুজনের বংশপরিক্রমার অভিন্নতা প্রমাণিত করতেন।

সঠিক তথ্য হলো, হযরত ইদরিস আ. হলেন হযরত নুহ ও হযরত ইবরাহিম আলাইহিমুস সালামের মধ্যবর্তী যুগের নবী। আর হযরত ইলয়াস আ. হলেন ইসরাইলি নবী। যিনি হযরত মুসা আ.-এর পর প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত তাবারি রহ. বলেন, তিনি হলেন হযরত আল-ইয়াসাআ আ.-এর চাচাতো ভাই। হযরত হিযকিল আ.-এর পর তিনি নবুয়ত লাভ করেছিলেন।

বংশপরম্পরা

অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে, হযরত ইলয়াস আ. ছিলেন হযরত হারুন আ.-এর বংশধর। তাঁর বংশপরিক্রমা হলো, ইলয়াস বিন ইয়াসিন বিন ফাতহাস বিন ইয়াযার বিন হারুন অথবা ইলয়াস বিন আযার বিন ইয়াযার বিন হারুন আ.।

কুরআনুল কারিমে হযরত ইলয়াস আ.-এর আলোচনা

কুরআনুল কারিমে হযরত ইলয়াস আ.-এর কথা দুই স্থানে এসেছে। সুরা আনআম ও সুরা আস-সাফ্ফাত। সুরা আনআমে তাঁকে কেবল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের তালিকায় গণনা করা হয়েছে। আর সুরা আস-সাফ্ফাতে তাঁর নবুয়ত লাভ এবং জাতির হেদায়েত-সম্পর্কিত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুরা আনআমের ৮৫ নং আয়াতে এবং সুরা আস-সাফ্ফাতের ১৩১ নং আয়াত থেকে ১৪৩ নং আয়াত পর্যন্ত তাঁর বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

নবুয়ত লাভ

মুফাসসিরিনে কেরাম ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, হযরত ইলয়াস আ. শামদেশের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। বা'লাবাক্কা নামের প্রসিদ্ধ শহরটি ছিলো তাঁর রিসালাত ও হেদায়েতের কেন্দ্রভূমি।

হযরত ইলয়াস আ.-এর জাতি প্রসিদ্ধ মূর্তি 'বা'ল'-এর উপাসনা করতো। তাওহিদের শিক্ষা বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছিলো। আল্লাহর এ মহান নবী তাদেরকে বুঝান এবং হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করেন। মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজার বিরুদ্ধে ওয়ায-নসিহত করে একনিষ্ঠ তাওহিদের দিকে আহ্বান করেন।

হযরত ইলয়াস আলাইহিস সালাম-এর জাতি ও বা'ল দেবতা

বা'ল দেবতা ছিলো পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন সামি সম্প্রদায়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় দেবতা। এটি ছিলো পুরুষ দেবতা। তার স্ত্রী মনে করা হতো যুহাল অথবা মুশতারি দেবীকে।

ফাইনিকি, কিনআনি, মু-আবি এবং মাদয়ানি গোত্রগুলো বিশেষভাবে তার পূজা করতো। এ-কারণে প্রাচীন যুগ থেকেই এই বা'ল দেবতার পূজা চলে আসছিলো। মু-আবি ও মাদয়ানিরা হযরত মুসা আ.-এর যুগ থেকেই এই

দেবতার পূজা করে আসছিলো। শামদেশের প্রসিদ্ধ নগরী বা'লাবাক্কার[১] নাম রাখা হয় সেই দেবতার নামের সঙ্গে মিলিয়ে। মাদয়ান নগরীতে এই দেবতার পূজারীদের হেদায়েতের জন্য হযরত শুয়াইব আ. প্রেরিত হন। কিছু কিছু ইতিহাসবিদের ধারণা, হিজায অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মূর্তি 'হুবাল'-ই হলো ওই 'বা'ল' দেবতা।

বা'ল দেবতার বড়ত্ব তাদের মনে এতটাই গেঁথে গিয়েছিলো যে, তারা এ দেবতাকে অসংখ্য বদান্যতার অধিকারী বিশ্বাস করে আরো অনেকগুলো নাম দিয়েছিলো। তাওরাতে সামি জাতিগুলোর পূজ্য দেবতা হিসেবে 'বা'ল'-এর নাম বলা হয়েছে, بعل بريث [বা'লে বারিস] ও بعل فغور [বা'লে ফাগুর]। আকরুনি জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তাকে স্মরণ করতো بعل زبوب [বা'লে যাবুব] নামে। কালদানি গোষ্ঠীর লোকেরা উচ্চারণ করতো বি'ল [বা বর্ণে যের দিয়ে]। এছাড়াও তারা بيل [বিল] بيلوس [বিলুস] এবং بعل [বি'ল] بعلوس [বি'লুস]ও বলতো।

সামি ও ইবরানি ভাষায় بعل শব্দের অর্থ হলো, মালিক, সর্দার, শাসক ও প্রভু। এ কারণে আরবের লোকেরা স্বামীকে بعل বলে থাকেন। কিন্তু যখন এ শব্দের শুরুতে الف لام [আলিফ লাম] আসে অথবা তাকে কোনো বস্তুর দিকে إضافت [যুক্ত বর্ণ] হিসেবে বলা হয়, তখন তার দ্বারা শুধু দেবতা ও উপাস্য অর্থই উদ্দেশ্য হয়।

ইয়াহুদের ও পূর্বাঞ্চলীয় ইসরাইলিরা বা'ল দেবতার অর্চনা করার জন্য বিভিন্ন মৌসুমে বিশাল আকারে সভার আয়োজন করতো। তার জন্য বিশাল আকারের বেদী নির্মাণ করতো। জ্যোতিষীরা সেটির ওপর লোবানের ধোঁয়া দিয়ে বিভিন্ন রকমের সুগন্ধি মেখে দিতো। কখনো কখনো বেদীতে নরবলিও দিতো।[২]

---

[১] বর্তমানে লেবাননে।

[২]. দায়েরাতুল মা'আরিফ আল বুসতানি : ৫

তাফসিরের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, বা'ল দেবতা ছিলো স্বর্ণনির্মিত। তার উচ্চতা ছিলো বিশ গজ। তার চারটি মুখ ছিলো। তার সেবা করার জন্য চারশো সেবক নিযুক্ত ছিলো।[৩]

হযরত ইলয়াস আ.-এর যুগেও ইয়ামান ও শামদেশে এই বা'ল দেবতাই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো। তাঁর জাতির লোকেরা অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বিশেষভাবে এই মূর্তিটির পূজা-অর্চনা করতো। হযরত ইলয়াস আ.-এর আলোচনার সূত্র ধরে কুরআনুল কারিমে এ মূর্তিটির আলোচনাও উঠে এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে—

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ () إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ () أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ () اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ () فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ () إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ () وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ () سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ () إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ () إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ () وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ()

'ইল্‌য়াসও ছিলো রাসুলদের একজন। স্মরণ করো, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'লকে ডাকবে আর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে ছেড়ে দেবে আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের, প্রতিপালক তোমাদের পূর্বপুরুষদের।' কিন্তু তারা তাদের মিথ্যাবাদী বলেছিলো। কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা ভিন্ন। আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইল্‌য়াসীনের[৪] ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের একজন।' [সুরা আস-সাফ্‌ফাত: আয়াত ১২৩-১৩৩]

---

[৩]. রুহুল মা'আনি : ২৩/৬২৭

[৪] ইলইয়াসীন আ.-এর আরেক নাম ইল্‌য়াস আ.।

একটি সূক্ষ্ম তাফসির

সুরা আনআমের যে আয়াতে হযরত ইলয়াস আ.-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি মূলত হযরত নুহ ও হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধর ও তার পরবর্তী প্রজন্মের নবী-রাসুলগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

ইরশাদ হয়েছে—

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

'এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিক করেছিলাম; পূর্বে নুহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তাঁর বংশধর দাউদ, সুলাইমান ও আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও; আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি; এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইল্য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত; আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল্-ইয়াসাআ, ইউনুস ও লুতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের ওপর প্রত্যেককে।' [সুরা আনআম : আয়াত ৮৪-৮৬]

কুরআনুল কারিম এ তালিকায় আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মহলের আলোচনা করেছে। এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা কী? অধিকাংশ মুফাসসিরিনে কেরাম সেই রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাদের সকলের অভিমত সামনে রাখার পর 'আল মানার' গ্রন্থের লেখকের অভিমতটিকেই সবচেয়ে উত্তম মনে হলো।

যার সারাংশ হলো, আল্লাহ তাআলা এই স্থানে নবী ও রাসুলগণকে তিনটি পৃথক পৃথক জামাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, বনি ইসরাইলে যত নবী প্রেরিত হয়েছেন, তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাকালে তিন ধরনের জামাত পাওয়া যাবে।

কতিপয় নবী এমন ছিলেন, যারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, শাসক ছিলেন অথবা মন্ত্রিত্ব ও সর্দারির অধিকারী ছিলেন।

অন্যদিকে কতিপয় নবীর জীবন ছিলো এর সম্পূর্ণ উল্টো। তারা ছিলেন সম্পূর্ণ সংসারত্যাগী। রাজত্ব ও ঐশ্বর্যকে প্রত্যাখ্যান করে দীনতার জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন।

আরেকদল নবী ছিলেন এ দু-দলের মধ্যবর্তী। তারা যেমন জাতির সিংহাসনের শোভাবর্ধনকারী মহাশাসক ছিলেন, তেমনি ছিলেন দুনিয়াত্যাগী সাধক। বরং একদিকে তারা ছিলেন জাতির জন্য সত্যের পথ প্রদর্শনকারী নবী, অপরদিকে মধ্যপন্থী জীবনের সঙ্গে তাদের ছিলো সবসময়ের সম্পর্ক।

এ কারণেই যখন কুরআনুল কারিম সেই নবী-রাসুলদের তালিকা উল্লেখ করার সময় তাদের নবুয়তপ্রাপ্তির কাল এবং সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ না করে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে বিভক্ত করেছে। তবে মর্যাদাগত ক্রমবিন্যাসের আলোকে নাম উল্লেখ করার নীতি পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ প্রথম তালিকায় প্রথম হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের নাম উল্লেখ করেছে। তাঁরা যেমন নবী ছিলেন, সম্রাজ্যের অধিকারীও ছিলেন। তাঁদের পরে হযরত আইয়ুব ও হযরত ইউসুফ আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা যদিও সম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু প্রথমজন একটি ছোট্ট জমিদারির অধিকারী ছিলেন।

আর দ্বিতীয়জন তৎকালীন মিসর সরকারের একজন স্বাধীন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁদের পরে এসেছে হযরত মুসা আ. ও হযরত হারুন আ.-এর নাম। তাঁরা কোনো বড় সম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না, কোনো ছোটখাট জমিদারিও তাঁদের ছিলো না, অথবা তাঁরা কোনো প্রশাসনের মন্ত্রী বা সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন জাতির জন্য নবী ও রাসুল, পাশাপাশি তাঁরা ছিলেন জাতির সর্দার।

দ্বিতীয় তালিকায় সেসকল আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের নাম এসেছে, যাঁরা গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও সংসারত্যাগী অবস্থায়। তাঁরা যেমন বসবাসের উদ্দেশে কোনো গৃহ নির্মাণ করেন নি, তদ্রূপ পানাহারের বস্তুও সঞ্চয় করেন নি। সারাদিন তাঁরা

দীনের দাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন আর রাতভর আল্লাহর যিকির করার পর যেখানেই সুযোগ পেতেন, মাথার নিচে হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া, ঈসা ও ইলয়াস আলাইহিমুস সালাম ছিলেন এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সুখ্যাতির অধিকারী মহান নবী।

তৃতীয় তালিকায় এসেছে সেই মহান নবীদের নাম, যাঁরা রাজত্ব কিংবা সিংহাসনেও আরোহণ করেন নি, আবার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে দুনিয়াত্যাগী জীবনও বরণ করেন নি। বরং তাঁরা ছিলেন এ দুটির মধ্যবর্তী জীবনের অধিকারী। এভাবেই তাঁরা দীনের তাবলিগের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। হযরত ইসমাইল, আল-ইয়াসাআ, ইউনুস ও লুত আলাইহিমুস সালাম ছিলেন সেই মধ্যপন্থী জীবনের অধিকারী।

শিক্ষা ও উপদেশ

হযরত ইলয়াস আ. ও তাঁর জাতির আলোচনা যদিও কুরআনুল কারিমে খুবই সংক্ষেপে এসেছে, তারপরও তাদের ইতিহাস থেকে অন্তত এতটুকু শিক্ষা অর্জিত হয় যে, বনি ইসরাইলের ইহুদিদের মানসিকতা এতটাই বিকৃত ছিলো যে, দুনিয়ার হেনো মন্দ কাজ নেই, যা করতে তাদের মন লালায়িত ছিলো না। এর বিপরীতে কোনো ভালো কাজের প্রতি তাদের পাপী মন উৎসাহবোধ করতো না। নবী ও রাসুলের আগমনের ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও মূর্তিপূজা, বস্তুপূজা, নক্ষত্রপূজা মোটকথা গায়রুল্লাহর উপাসনার এমন কোনো ক্ষেত্র অবশিষ্ট ছিলো না, যার সামনে তারা মাথা নত না করে থেকেছে।

কুরআনুল কারিমে আলোচিত বনি ইসরাইলের ইতিহাস যেভাবে তাদের দুশ্চরিত্রতা ও মানসিক বক্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছে, তার সঙ্গে আমাদেরকেও এ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছে যে, এখন যদিও নবী ও রাসুলদের আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন ও কুরআনুল কারিমের অবতরণ সেই ধারাবাহিকতার গতিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, কাজেই এখন আমাদের অনিবার্য দায়িত্ব হলো, বনি ইসরাইলের বিকৃত

প্রকৃতি ও ধ্বংসাত্মক মানসিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে আল্লাহর আহকাম দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরা।

এক্ষেত্রে কোনোভাবেই খোদাদ্রোহিতা ও মানসিক বক্রতার শিকার হওয়া যাবে না। এমনকি তা কল্পনা করার দুঃসাহসও দেখানো যাবে না। কাজেই আমাদের স্বভাব হতে হবে, আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্থন। অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান কোনোভাবেই কাম্য নয়। এরই নাম ইসলাম। ইসলামের এই একটাই অর্থ।

contents

হযরত আল-ইয়াসাআ (الْيَسَعُ) আলাইহিস সালাম

নাম ও বংশ

ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ রহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি ইসরাইলি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর নাম আল-ইয়াসাআ। তিনি ছিলেন খুতুব-এর পুত্র। ইবনে ইসহাক রহ.-ও এ রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আল-ইয়াসাআ আ. ছিলেন হযরত ইলয়াস আ.-এর চাচাতো ভাই।

ইবনে আসাকির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে তাঁর বংশপরম্পরার বৃত্তান্ত আলোচনা করে লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের বংশধর।

তাঁর বংশপরম্পরা হলো : আল-ইয়াসাআ বিন আদি বিন শাওতাম বিন ইফরাইম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম। যদি তাওরাতের يسيعاه [ইয়াস্ইয়াহ] নবী আর হযরত আল-ইয়াসাআ আ. একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে তাওরাতের ভাষ্যমতে তাঁর পিতার নাম আমুস।

নবুয়তলাভ

হযরত আল-ইয়াসাআ আ. হযরত ইলয়াস আ.-এর পরলোকগমনের পর তাঁর প্রতিনিধি ও খলিফা হয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে তিনি তাঁর সংস্পর্শে থাকতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর মহান আল্লাহ বনি ইসরাইলের হেদায়েতের জন্য হযরত আল-ইয়াসাআ আ.-কে নবুয়ত প্রদান করেন। তিনি হযরত ইলয়াস আ.-এর তরিকা অনুযায়ী বনি ইসরাইলের পথপ্রদর্শন করেন। তবে হযরত আল-ইয়াসাআ আ. কত বছর

হায়াত পেয়েছিলেন এবং তিনি বনি ইসরাইলে কত দিন তাবলিগের দায়িত্ব পালন করেছেন, এ বিষয়ে ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।

কুরআনে হযরত আল-ইয়াসাআ আ.-এর আলোচনা

কুরআনুল কারিম তাঁর জীবনবৃত্তান্তের ওপর তেমন একটা আলোকপাত করে নি। সুরা আনআম ও সুরা সাদে শুধু তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

'আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাইল, আল্-ইয়াসাআ, ইউনুস ও লুতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের ওপর প্রত্যেককে।' [সুরা আনআম : আয়াত ৮৬]

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ

'স্মরণ করো, ইসমাইল, আল-ইয়াসাআ ও যুল-কিফলের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিলেন সজ্জন।' [সুরা সাদ : আয়াত ৪৮]

শিক্ষা ও উপদেশ

বনি ইসরাইলের যেসকল নবী আল্লাহর অতিমহান নবী-রাসুলদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের সাহচর্যের বদৌলতে ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের কল্যাণে পরবর্তীকালে খেলাফত লাভ করার পর নবুওতের সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তাঁদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে এ শিক্ষা লাভ করা যায় যে, সৎ লোকদের সাহচর্য কল্যাণ অর্জনের মহৌষধ। হযরত রুমি রহ. চমৎকার বলেছেন—

یک زمانہ صحبت با اولیا   بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

'আওলিয়া কেরামের সঙ্গে তোমার মুহূর্তকালের সাহচর্য একশো বছর খাঁটি বাদতের চেয়ে উত্তম।'

contents

যদি কোনো কামেল ব্যক্তিত্বের সাহচর্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি হাজার বছর তপস্যা ও সাধনা করেও যায়, তাহলেও এটি অনেক বড় শূন্যতা, যা কেবল কামেল ব্যক্তিত্বের সাহচর্য দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে। কাজেই সৎ লোকদের সঙ্গে থাকার অনিবার্যতা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

হযরত শামাবিল
আলাইহিস সালাম

contents

বনি ইসরাইলের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাত

হযরত ইউশা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার পর মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি সেই এলাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তারা ওখানে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে এবং সত্যধর্মের জন্য কাজ করতে পারে। তাওরাতে ইয়াশুআর ২৩ নং অধ্যায়ে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত ইউশা আ. শেষ জীবন পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধনে সচেষ্ট থেকেছেন। এ সময় তিনি তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করার জন্য বেশ কয়েকজন বিচারকও নিযুক্ত করে দেন, যাতে তারা আগামীতেও এভাবে নির্ধারিত নীতিমালা ও শৃঙ্খলা ধরে রাখে।

হযরত মুসা আ.-এর জন্মের প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পূর্ব পর্যন্ত সেই শৃঙ্খলা এভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, গোষ্ঠী ও বংশগুলোর ওপর 'সরদাররা' শাসন করতেন এবং তাদের পারস্পরিক বিবাদ ও লেনদেনগুলোর ক্ষেত্রে 'কাযি' ফয়সালা করতেন। আর 'নবী' উল্লিখিত বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করার সঙ্গে সঙ্গে দীনের দাওয়াত ও তাবলিগের খেদমত আঞ্জাম দিতেন। কখনো কখনো এমনও হতো যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁদের মধ্য থেকে কোনো কাযিকে নবুয়ত প্রদান করা হতো। এই দীর্ঘ সময়ে বনি ইসরাইলে একক ক্ষমতার অধিকারী কোনো বাদশাহ ছিলো না। তাদের সকলের একক শাসক না থাকার ফলে আশ-পাশের জাতিগুলো প্রায়সময় তাদের ওপর আক্রমণ করতো আর বনি ইসরাইল হতো তাদের সেই আক্রমণের লক্ষ্য।[১] কখনো আমালিকা সম্প্রদায় আক্রমণ করতো। কখনো ফিলিস্তিনিরা তেড়ে আসতো। কখনো মাদায়িনিরা হামলে পড়তো। কখনো আরামি গোত্রের লোকেরা আক্রমণ করতো। এই জাতিগুলোর কোনোটি

---

১. কুযাত : অধ্যায় নং ২, আয়াত নং ৬-৭ ও কুযাত : অধ্যায় নং ২১, আয়াত নং ২৫

কখনো আক্রমণ করে পরাজিত হলেও পরবর্তীকালে আবার আক্রমণ ও লুটপাট করতো। এভাবেই দিন অতিবাহিত হতো। কখনো এরা বিজয়ী হতো, আবার কখনো ওরা বিজয়ী হতো।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে আইলি কাহেনের যুগে আশদুদ[১] ও গাজার আশপাশের ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী তাদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে বরকতময় সিন্দুক 'তাবুতে সাকিনাহ' ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই সিন্দুকে তাওরাতের মূল ফলক, হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের লাঠি, জামা এবং মান্না-এর চিনামাটির তৈজসপত্র সংরক্ষিত ছিলো। ফিলিস্তিনিরা বস্তুগুলোকে তাদের প্রসিদ্ধ মন্দির বাইতে দাজুনে রেখে দেয়। এই মন্দিরটির নামকরণ করা হয়েছিলো তাদের সবচেয়ে বড় দেবতা 'দাজুন'-এর নামে। দাজুনের দেহ ছিলো মানুষের চেহারা ও মাছের মুণ্ডুর সমন্বিত আকৃতিতে তৈরি। ওই মন্দিরে সেই দাজুন দেবতার প্রতিকৃতি রাখা ছিলো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নাজ্জার মিসরি বলেন, ফিলিস্তিনের বিখ্যাত নগরী রামাল্লার কাছে আজও একটি জনপদ পাওয়া যায়, যার নাম 'বাইতে দাজুন'। প্রবল ধারণামতে, তাওরাতে দাজুনের যে মন্দিরের কথা বলা হয়েছে সেটি এখানেই অবস্থিত ছিলো। তার দিকে সম্পৃক্ত করেই এ জনপদের নাম রাখা হয়েছিলো 'বাইতে দাজুন'।[২]

নাম ও বংশ পরিচিতি

আইলি কাহেনের যুগ শেষ হওয়ার পর সেই কাযিদের মধ্য হতে অন্যতম কাযি শামাবিল আ.-কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত প্রদান করা হয়। তিনি তখন বনি ইসরাইলের হেদায়েত প্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যখন হযরত আল-ইয়াসাআ আ.-এর ইন্তিকালের সময় মিসর ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী রোমসাগরের পাদদেশে বসবাস করতো আমালিকা সম্প্রদায়। তাদের অত্যাচারী শাসক 'জালুত' বনি ইসরাইলকে পরাজিত করে তাদের বাড়ি-ঘর দখল করে

---

[১] ফিলিস্তিনের একটি এলাকার নাম।

[২]. কাসাসুল আম্বিয়া

ফেলে। এসময় সে তাদের অনেক সর্দার ও বিভিন্ন শাখাগোত্রের সম্মানিত লোকদেরকে গ্রেফতার করে সঙ্গে নিয়ে যায়। আর অন্যদেরকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করে এবং তাদের ওপর কর আরোপ করে। এ সময় জালুত তাওরাতও ধংস করে ফেলে। বনি ইসরাইলের ইতিহাসে এটি ছিলো চরম দুঃসময় ও ক্রান্তিকাল। তাদের মধ্যে কোনো নবী-রাসুল ছিলেন না। এমনকি কোনো সর্দার ও গোত্রপতি ছিলো না। নবুওতের বংশে এক গর্ভবতী মহিলা ছাড়া অন্যকোনো সদস্যও ছিলো না। এমন অধঃপতিত ও সঙ্কটময় অবস্থাতেও মহান আল্লাহ তাদের ওপর অনুগ্রহ করেন। ফলে ওই মহিলার গর্ভ থেকে এক সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তার নাম রাখা হয় শামাবিল। বনি ইসরাইলের জনৈক বুযুর্গ তার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। তার থেকেই হযরত শামাবিল তাওরাত হেফজ করেন এবং দীনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কালক্রমে সেই শামাবিল বনি ইসরাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াতের পদে ভূষিত করেন এবং বনি ইসরাইলের হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেন।[৩]

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত শামাবিল আ. ছিলেন হযরত হারুন আ.-এর বংশধর।[৪] তাঁর বংশপরম্পরা হলো, শামাবিল বিন হান্নাহ বিন আকির।[৫] আকিরের উর্ধতন পুরুষদের নাম সংরক্ষিত নেই। তবে মুকাতিল রহ.-এর বর্ণনায় এ সংযুক্তি রয়েছে, ইশমাবিল বিন বালি বিন আলকামা বিন ইয়ারখাম বিন ইয়াহু বিন তাহু বিন সওফ বিন আলকামা বিন মাহেছ বিন আমুস বিন আযায়া।[৬]

ইশমাবিল একটি ইবরানি শব্দ। আরবিতে যার অনুবাদ, ইসমাইল। অধিক ব্যবহারের ফলে ইশমাবিল থেকে শামাবিলে রূপান্তরিত হয়েছে।

মোটকথা, যখন শামাবিল আ.-এর যুগেও আমালিকা জাতির আগ্রাসন ও অত্যাচার চলতে থাকে তখন বনি ইসরাইল তাঁর কাছে আবেদন পেশ করে যে, আপনি আমাদের ওপর একজন বাদশাহ (শাসক) নিযুক্ত করে দিন,

---

[৩]. রুহুল মা'আনি : ২/১৪২

[৪]. খাযেন : ২য় খণ্ড

[৫]. রুহুল মা'আনি : ২য় খণ্ড

[৬]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৫

যার নেতৃত্বে আমরা জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে দুশমনদের চাপিয়ে দেয়া মুসিবতের সমাপ্তি ঘটাবো। 'আমাদের ওপর একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন' বনি ইসরাইলের এই আবেদনের কারণ ব্যাখ্যা করে তাওরাতে এসেছে—

'আর এমন ঘটলো যে, যখন শামাবিল বৃদ্ধ হয়ে গেলেন তখন তিনি তার সন্তানদেরকে বিচারক নিযুক্ত করলেন যে, তারা ইসরাইলের ন্যায় বিচার করবে। তার প্রথম পুত্রের নাম ছিলো ইউইল। আর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিলো ইবইয়াহ। তারা দুজন ছিলো বিরে সাবাআ-এর বিচারক। কিন্তু তাঁর পুত্রেরা পিতার পথে চললো না। বরং তারা পার্থিব লাভের অনুগামী হলো। ঘুষ নিতো এবং বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্ব করতো। যখন সমস্ত ইসরাইলি বুযুর্গ একত্র হয়ে রাস্তায় শামাবিলের কাছে এলো এবং তাকে বললো, আপনি বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং আপনার ছেলেরা আপনার পথে চলছে না, কাজেই কাউকে আমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যিনি আমাদেরকে শাসন করবেন। যেভাবে সমস্ত গোত্রে হয়ে থাকে।'[১]

তাওরাতে বলা হয়েছে যে, তাদের এ প্রস্তাব শামাবিলের মনঃপূত হয় নি। তিনি তাদের বলেন, যদি কাউকে তোমাদের ওপর বাদশাহ বানিয়ে দিই তাহলে সে তোমাদের সবাইকে তার সেবক ও গোলাম বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু বনি ইসরাইলের লোকেরা তার কথা না শুনে গোঁ ধরে থাকলো। অবশেষে শামাবিল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিনইয়ামিনের বংশের 'সাউল' [তালুত] নামের এক ব্যক্তিকে বাদশাহ নির্ধারণ করে দিলেন। তালুত ছিলেন সুন্দর চেহারা ও বিশাল দেহের অধিকারী সুপুরুষ।

সালাবি রহ. তালুতের বংশপরিচয় এভাবে দিয়েছেন, সাউল বিন কায়শ বিন উফায়ল বিন সারিদ বিন তাহুরাত বিন উফায়হ বিন উনায়স বিন বিনইয়ামিন বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম।[২]

কিন্তু কুরআনুল কারিম বনি ইসরাইলের উপর্যুপরি আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত শামাবিল আ.-এর যে জবাব বর্ণনা করেছে তা তাওরাতের বর্ণনা

---

[১]. স্যামুয়েল : অধ্যায় : ৮, আয়াত : ২৪ । ও অধ্যায় : ৯

[২]. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ২/৬

থেকে আলাদা এবং বনি ইসরাইলের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কুরআনুল কারিমে এসেছে যে, বনি ইসরাইল হযরত শামাবিল আ.-এর কাছে বাদশাহ নিযুক্ত করে দেয়ার আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে বলেন, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, যখন কাউকে তোমাদের ওপর রাজা নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তোমরা কাপুরুষ প্রমাণিত হবে এবং জিহাদ করতে অস্বীকার করবে।'

তখন বনি ইসরাইল বেশ শক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলো, 'এটা কী করে সম্ভব যে, আমরা জিহাদ করতে অস্বীকার করবো, যখন আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে, আমাদেরকে শত্রুপক্ষ চূড়ান্ত লাঞ্ছিত করেছে, তারা আমাদেরকে আমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আমাদের সন্তানদেরকে বন্দি করেছে?'

যখন হযরত শামাবিল আ. তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পূর্ণ করলেন তখন আল্লাহর দিকে অভিমুখী হলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে অবহিত করলেন যে, বনি ইসরাইলের আবেদন গৃহীত হয়েছে। আমি তালুতকে, যিনি বিদ্যা-বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে তোমাদের মধ্যে বিশিষ্ট, তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করলাম। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত বনি ইসরাইলের মনঃপূত হলো না। তারা কপালে কুঞ্চন তুলে বললো, 'এ লোকটি তো গরিব। তার কোনো ধন-দৌলত নেই। সে কীভাবে আমাদের বাদশাহ হয়? আমরাই তো রাজা হওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। আমাদের মধ্য হতে কাউকে রাজা বানিয়ে দিন।'

ঐতিহাসিকগণ বলেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত বনি ইসরাইলের লাবির[৩] বংশে নবুওতের ধারা আর ইয়াহুদার বংশে শাসনক্ষমতা ও নেতৃত্বের ধারা চলে

---

[৩]. ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে হবে। হযরত ইয়াকুব আ.-এর এক পুত্রের নাম ছিলো লাবি। সেই পুত্রের বংশে সাধারণত ইসরাইলি নবীগণ জন্মগ্রহণ করতেন। হযরত মুসা আ. ও হারুন আ. সেই বংশেরই সন্তান। হযরত ইয়াকুব আ.-এর আরেক পুত্রের নাম ছিলো ইয়াহুদা। সাধারণত এ বংশের লোকেরাই রাজা ও সর্দার হতেন। হযরত দাউদ আ. ও সুলাইমান আ. ছিলেন এ বংশেরই সন্তান। হযরত ইয়াকুব আ.-এর অপর সন্তান বিনইয়ামিনের বংশধর হযরত তালুত যেহেতু এ দুই বংশের কোনো বংশের ছিলেন না, এ জন্য তাঁর রাজা হওয়াটা বনি ইসরাইলের অন্য সর্দাররা মেনে নিতে পারে নি। -[অনুবাদক]

আসছিলো। হযরত শামাবিল আ.-এর নির্দেশনায় এ সৌভাগ্য বিনইয়ামিনের বংশে চলে গেলে বনি ইসরাইলের অন্য সর্দারদের মনে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তারা কিছুতেই ব্যাপারটিকে মেনে নিতে পারছিলো না।

বনি ইসরাইলের আজন্ম অভ্যাস হলো, যে কোনো বিষয় প্রথম প্রথম মেনে নেবে আর এরপর সময়মতো তা অস্বীকার করে বসবে। এখানেও ওই অভ্যাস কাজ করেছে। কেননা, তারা মনে করেছিলো, নিশ্চয়ই শামাবিল আমাদের মধ্য হতে কাউকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করবেন। এ কারণে যখন তারা দেখলো যে, তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে গিয়ে বিনইয়ামিনের বংশ থেকে একজন গরিব অথচ শক্তিশালী ও জ্ঞানী ব্যক্তি এ সিংহাসনে আরোহণ করেছে তখন তাদের হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। তারা তখন টালবাহানা করতে শুরু করলো।

হযরত শামাবিল আ.-এর বনি ইসরাইলের এসব আপত্তি উপস্থাপনকারী সর্দারদের সমালোচনার জবাব দিয়ে বলেন, 'আমি আগে থেকেই জানতাম, তোমাদের কাপুরুষতা ও কূপমণ্ডূকতা তোমাদের সাময়িক আবেগ ও ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনাকে কখনো দৃঢ় ও স্থায়ী হতে দেবে না। সময় ঘনিয়ে এলে তোমাদের এই রক্তগরম করা আবেগ বরফের মতো গলে হারিয়ে যাবে। এ কারণেই তোমরা এখন কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছো। তোমাদের ভালোভাবে জানা থাকা দরকার যে, তোমরা যে সম্পদের প্রাচুর্য ও বিত্ত-বৈভবকে শাসক হওয়ার মানদণ্ড মনে করে আছো, তা সম্পূর্ণ ভুল ও অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান বৈ কিছু নয়।

মহান আল্লাহর কাছে একজন শাসকের ব্যক্তিগত গুণ হিসেবে জ্ঞানের শক্তি ও শারীরিক বল সবচাইতে বেশি জরুরি। কেননা, যার মধ্যে এ দুটি গুণ থাকবে, তার থেকে সুন্দর কৌশল, সুস্থ চিন্তা ও সাহসিকতার প্রকাশ ঘটবে। তোমাদের মধ্যে একমাত্র তালুতই এ সকল গুণের অধিকারী।

কুরআনুল কারিমের নিম্নের আয়াতসমূহ উল্লিখিত ইতিহাসের ন্যায়ানুগ সাক্ষী—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ

لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ () وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ()

'তুমি কি মুসার পরবর্তী বনি ইসরাইল প্রধানদেরকে দেখোনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিলো, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত করো যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' সে বললো, এটা তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বললো, 'আমরা যখন নিজ নিজ আবাসভূমি ও নিজেদের সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে কেনো যুদ্ধ করবো না? এরপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আর আল্লাহ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলো, 'আল্লাহ অবশ্যই তালুতকে তোমাদের রাজা করেছেন।' তারা বললো, 'আমাদের ওপর তার রাজত্ব কীভাবে হবে, যখন আমরা তার থেকে রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয় নি।' নবী বললেন, 'আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।' আল্লাহ যাকে ইচ্ছে নিজ রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৬-২৪৭]

তাবুতে সাকিনা

বনি ইসরাইলের সেই টালবাহানা এতটাই দীর্ঘ হলো যে, তারা হযরত শামাবিল আ.-এর কাছে দাবি করলো, যদি তালুতের নিযুক্তি মহান

আল্লাহর সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে তাহলে এর সত্যায়নে আল্লাহর নিদর্শন দেখাতে হবে। হযরত শামাবিল আ. বললেন, যদি তোমরা আল্লাহর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে কোনো প্রমাণ চাও তাহলে তোমাদের যাবতীয় সংশয় দূর করার জন্য তাও দেখানো হবে। আর তা হলো, যে বরকতময় সিন্দুক [তাবুতে সাকিনা] তোমাদের হাতছাড়া হয়ে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে, যার মধ্যে তাওরাত এবং হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষিত ছিলো, সেটি তালুতের বদৌলতে তোমাদের হাতে ফিরে আসবে। আল্লাহর প্রজ্ঞাদীপ্ত কর্মকৌশলের কল্যাণে এমন ঘটবে যে, তোমাদের চোখের সামনে ফেরেশতারা সেটিকে উঠিয়ে আনবে এবং সেটি দ্বিতীয়বার তোমাদের নাগালে আসবে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

'আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, 'তার রাজত্বের নিদর্শন হলো, তোমাদের নিকট তাবুত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্তপ্রশান্তি এবং মুসা ও হারুনের বংশধররা যা রেখে গেছে, তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।' [সুরা বাকারা : ২৪৮]

হযরত শামাবিল আ.-এর এ সুসংবাদ অবশেষে বাস্তবায়িত হয়। বনি ইসরাইলের সামনে আল্লাহর ফেরেশতাগণ তালুতের কাছে 'তাবুতে সাকিনা' অর্পণ করে। ফলে তাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা যদি হযরত শামাবিল আ.-এর এই ইলহামি সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেয় তাহলে অনাগত দিনে নিশ্চিত বিজয় ও সাফল্য তাদের পদচুম্বন করবে।

তাওরাতে 'তাবুতে সাকিনা'-এর প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা খুবই চটকদার। নিম্নে তার সারাংশ তুলে ধরা হলো—

'স্যামুয়েলের পুস্তিকায় রয়েছে, যেদিন থেকে তাবুতে সাকিনা লুণ্ঠন করে বাইতে দাজুনে রাখা হয় তারপর থেকে ফিলিস্তিনিরা প্রত্যহ এ দৃশ্য দেখতে পেতো যে, যখনই তারা ভোরবেলা তাদের উপাস্য 'দাজুন'-এর পূজা করতে যেতো, তাদের উপাস্য মূর্তিটিকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখতো। তারা সকালবেলা সেটিকে উঠিয়ে জায়গামতো রেখে দিতো। কিন্তু রাত পেরোতেই ভোরবেলা দেখতে পেতো যে, সেটি আগের মতো মাটিতে উল্টে পড়ে আছে। আরেকটি কাণ্ড ঘটেছিলো যে, তাদের নগরীতে ইঁদুরের উপদ্রব এত বেশি বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাদের সমস্ত শস্য-ফসলাদি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। তার সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের গলগণ্ড রোগের উপদ্রব দেখা দিলো। ফলে তাদের অনেকের প্রাণহানি ঘটতে লাগলো। ফিলিস্তিনিরা যখন দেখলো যে, কিছুতেই এই বিপদসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে না, তারা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আমাদের ওপর এত সব বিপদাপদের একমাত্র কারণ হলো সেই সিন্দুক। কাজেই সেটিকে এখনই বের করো।

ভাবনামাফিক তারা অনেক জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদদের একত্র করলো। তাদের কাছে গোটা বৃত্তান্ত উপস্থাপন করে নিষ্কৃতির উপায় প্রার্থনা করলো। জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদেরা তাদের বললেন, এর থেকে নিষ্কৃতির উপায় একটি। তা হলো, যত দ্রুত সম্ভব এ সিন্দুকটিকে বের করো। তার পন্থা হবে এমন যে, প্রথমে স্বর্ণের সাতটি ইঁদুর ও সাতটি গলগণ্ড বানানো হবে। সেগুলোকে একটি গাড়ির ওপর সিন্দুকের সঙ্গে রাখা হবে। ওই গাড়ির সঙ্গে দুটি দুগ্ধবতী গাভী বেঁধে দেয়া হবে। এরপর গাড়িকে নগরীর বাইরে নিয়ে রাস্তায় এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে যে, যেদিকে সেই গাভী দুটির মুখ থাকবে সেদিকে সিন্দুক নিয়ে ছুটবে।

ফিলিস্তিনিরা তাদের নির্দেশ পালন করলো। আল্লাহর কুদরত দেখুন, সেই গাভীগুলো সেদিকেই ছুটলো যেদিকে ছিলো বনি ইসরাইলিদের বসতি। অবশেষে চলতে চলতে এমন এক ক্ষেতের পাশে গিয়ে থামলো, যেখানে ইসরাইলিরা তাদের শস্য কাটছিলো। তারা সিন্দুকটিকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড খুশিতে ফেটে পড়লো। তারা দৌড়ে বাইতে শামস শহরে এসে

সংবাদ জানালো। তখন বাইতে ইয়ারিম-এর ইহুদিরা এসে সেটিকে সসম্মানে উঠিয়ে নিলো এবং ইন্দাব-এর গৃহে সংরক্ষণ করলো। তার গৃহটি ছিলো একটি টিলার ওপর।[১]

আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার উল্লিখিত ঘটনা থেকে উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, তাবুতে সাকিনা সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে যে বলা হয়েছে, تحمله الملائكة : [সেটিকে ফেরেশতাগণ বহন করলেন] তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ফেরেশতাগণের পথপ্রদর্শনের কারণেই সেই গাভীগুলো সিন্দুক বহনকারী গাড়িটিকে কোনো চালক ছাড়াই অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে এসেছিলো। কুরআন ও বাইবেলের ভাষ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার জন্য উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিকে বেশ চমৎকার মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাখ্যাটি ভুল। কুরআনুল কারিমের ভাষ্য তা সমর্থন করে না।

কারণ হলো, কুরআনুল কারিমের আলোচনার সারাংশ হলো, তাবুতে সাকিনার প্রত্যাবর্তন ছিলো তালুতের শাসক হওয়ার সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আলামত। হযরত শামাবিল আ.-এর হাতে তা এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ বনি ইসরাইলের চোখের সামনে সেটিকে উঠিয়ে এনে তালুতের সামনে উপস্থিত করে। পক্ষান্তরে তাওরাতের ভাষ্য থেকে বুঝে আসে যে, গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া গাভীগুলো সেটিকে বাইতে শামসের সড়কে এনে ছেড়ে গিয়েছিলো। তবে এতটুকু ঘটেছিলো যে, গাভীগুলো ডানে-বামে মোড় নেয় নি। চোখ বরাবর চলতে চলতে অবশেষে বাইতে শামসের ক্ষেতগুলোর সামনে এসে থেমে পড়ে। যা ফিলিস্তিনিদের সীমান্তের বাইরে প্রথম ইসরাইলি সীমান্ত জনপদ। সেখানে এ কথাও রয়েছে যে, ফিলিস্তিনিরা সেই গাড়ির পেছনে পেছনে বাইতে শামসের সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিলো। যখন সেই গাড়ি বাইতে শামসের ক্ষেত পর্যন্ত এসে পড়ে তখন তারা ফিরে যায়। তাওরাতে এসেছে—

'সেই গাভীগুলো বাইতে শামসের সড়কের সোজা পথ ধরলো এবং রাজপথ ধরে চলতে লাগলো। সেগুলো চলার সময় গোঁ গোঁ শব্দ

---

[১]. স্যামুয়েল : ১, অধ্যায় : ৬, আয়াত : ১২

হচ্ছিলো। এ সময় সেগুলো ডানে বা বামে মোড় নেয় নি। ফিলিস্তিনি কুতুব সেগুলোর পেছন পেছন বাইতে শামসের সীমান্ত পর্যন্ত যায়। তখন বাইতে শামসের অধিবাসীরা উপত্যকায় গমের ফসল কাটছিলো। তারা চোখ তুলে উপর দিকে তাকাতেই সিন্দুক দেখতে পেলো।'[২]

তাওরাতের ভাষ্যমতে যে পদ্ধতিতে তাবুত হাতে এসেছে, তা কোনোভাবেই 'মুজেযা' বা 'নিদর্শন' হতে পারে না। বিশেষ করে যখন তাওরাতে এ ভাষ্য রয়েছে যে, 'বাইতে দাজুন'-এর গণক তার পেছন পেছন ইসরাইলি ক্ষেত-খামারের খুব কাছাকাছি এসেছিলো। যদি তাই সত্য হতো তাহলে কুরআনুল কারিম এরজন্য এত জোরদার শব্দ প্রয়োগ করে বলতো না যে, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ : তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

এছাড়াও কুরআনুল কারিমের আলোচনার ধরন এবং তার প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে যিনি সামান্য হলেও অবগত তিনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে, যদি তাবুতে সাকিনা বাইবেলে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী প্রাপ্ত হতো তাহলে কুরআনুল কারিম সেটিকে تحمله الملائكة শব্দে ব্যক্ত করতো না; বরং تهدي به الملائكة (সিন্দুকটির ব্যাপারে ফেরেশতাগণ পথ দেখিয়েছেন) বা এ জাতীয় এমন কোনো বাক্য ব্যবহার করতো, যা থেকে জানা যেতো যে, তাবুতে সাকিনা ফেরেশতাদের দেখানো পথ ধরে ইসরাইলিদের হাতে পৌঁছেছিলো।

আর যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে, তাওরাতে বর্ণিত বিবরণ সঠিক, তবুও তার সারমর্ম দাঁড়াবে এই যে, যখন তাবুতে সাকিনার উপস্থিতির কারণে বাইতে দাজুনের মূর্তিটি প্রতিদিন উপুড় হয়ে পড়ে যেতো এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সিন্দুকটিকে দাজুনের অঞ্চল থেকে বের করা হলো, তবে এটিও এক প্রকারের মুজেযা যা কোনো ধরনের বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াই দাজুনের মন্দিরে প্রকাশ পেয়েছিলো। কাজেই যে ব্যক্তি এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সঠিক বলে মেনে নিতে প্রস্তুত সে ব্যক্তির জন্য

---

[২]. স্যামুয়েল : ১, অধ্যায় : ৬, আয়াত : ১২

تحمله الملائكة এর এই পরিষ্কার ও সরল অর্থ মেনে নিতে সমস্যা কোথায় যে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ চোখের সামনে সেটিকে উঠিয়ে এনেছেন।

তালুত ও জালুতের যুদ্ধ এবং বনি ইসরাইলের পরীক্ষা

এত টালবাহানা শেষে বনি ইসরাইলিদের নতুন কোনো আপত্তি পেশ করার সুযোগ থাকলো না। অবশেষে হযরত শামাবিল আ.-এর ইলহামপ্রসূত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তালুতকে ইসরাইলিদের বাদশাহ মনোনীত করা হয়।

তালুত ক্ষমতায় আরোহণের পর বনি ইসরাইলিদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ঘোষণা জানিয়ে দেন যে, তারা যেনো ফিলিস্তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হতে প্রস্তুত থাকে। তালুতের নেতৃত্বে বনি ইসরাইলিরা রওয়ানা হলে তাদের জন্য শুরু হয় নতুন এক পরীক্ষা। তালুত চিন্তা করলেন যে, যুদ্ধ একটি নাজুক কাজ। অনেক সময় এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির কাপুরুষতা বা দ্বৈত ভূমিকার খেসারত হিসেবে গোটা সৈন্যদলকে ধ্বংস হতে হয়। এজন্য যুদ্ধের আগেই বনি ইসরাইলের এ দলটিকে পরীক্ষা করে নিতে হবে যে, কোন ব্যক্তি নির্দেশ পালন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সততা ও একনিষ্ঠতার অধিকারী আর কোন ব্যক্তি এসব গুণের অধিকারী নয়। কাজেই কাপুরুষ ও শঠ লোকদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। যাতে যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করার পূর্বেই এমন সদস্যদের আলাদা করে ফেলা যায়। কেননা, এই ময়দানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধৈর্য, দৃঢ়তা, আনুগত্য ও নির্দেশ পালন। কাজেই যে ব্যক্তি সামান্য তৃষ্ণার মুহূর্তে নির্দেশের ওপর দৃঢ় থাকতে পারবে না, তার পক্ষে যুদ্ধের মতো নাজুক মুহূর্তে নির্দেশের ওপর অবিচল থাকা অসম্ভব।

দলটি একটি নদীর তীরে এসে উপনীত হলে তালুত ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তাআলা এ নদীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেবেন। এখান থেকে কোনো ব্যক্তি তৃপ্তিসহ পান করতে পারবে না। যে কেউ এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাকে আল্লাহর দল থেকে বের করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি নির্দেশ মান্য করবে সে দলভুক্ত থাকবে। তবে কেউ ভীষণ তৃষ্ণা বোধ করলে তার জন্য এক আঁজলা পানি নিয়ে গলা ভেজানোর অনুমতি রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

contents

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

'অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বের হলো সে তখন বললো, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এ ছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও'। এরপর অল্পসংখ্যক ব্যতীত তারা সেখান থেকে পান করলো।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৯]

মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, ঘটনাটি জর্ডান নদীতে ঘটেছিলো।[১] বুখারি শরিফের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন, আমরা রাসুলের সাহাবীগণ পরস্পরে বলাবলি করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তালুতের অনুসারীদের সংখ্যার সমান।[২]

মোটকথা, ফল দাঁড়ালো এই যে, সৈন্যদল নদী অতিক্রম করার সময় সেসকল লোক নির্দেশ অমান্য করে পানি পান করেছিলো, তারা বলতে লাগলো, জালুতের মতো শক্তিশালী দেহের অধিকারী বলবান ব্যক্তি ও তার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে লড়বার মতো শক্তি আমাদের নেই।

পক্ষান্তরে যেসব লোক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আমিরের নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রমাণ দিতে পেরেছিলো তারা নির্ভয়ে বললো, আমরা অবশ্যই শত্রুদের মোকাবিলা করবো। কেননা, আল্লাহর কুদরতের এই প্রদর্শনী প্রায়শই ঘটে যে, ছোট দল বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করে। তবে এর জন্য অবশ্যই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তা শর্ত। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৮

[২]. বুখারি শরিফ, বাবুল মাগাযি

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'সে ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করলো তখন তারা বললে, 'জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যারা বিশ্বাস করতো, আল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বললো, 'আল্লাহর নির্দেশ কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে'! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।' [সুরা বাকারা: ২৪৯]

অতঃপর মুজাহিদ বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের মুখোমুখি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। শত্রুবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলো জালুত। লোকটি ছিলো শক্তিশালী দৈহিক কাঠামোর অধিকারী বলবান পুরুষ। তার সৈন্য ছিলো সংখ্যায়ও অধিক। মুজাহিদ বাহিনী মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে ইখলাসের সঙ্গে মিনতি জানালো যে, হে আল্লাহ, আপনি শত্রুদলের পরাজয় নিশ্চিত করুন। আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং বিজয়ের সাফল্যে ভূষিত করুন।

তাওরাতসহ সিরাতের বিভিন্ন কিতাবে এসেছে যে, এসময় বনি ইসরাইল ছিলো জালুতের অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রভাবে ভীত। সে যখন ব্যক্তিগতভাবে লড়াই করার আমন্ত্রণ জানালো, তখন তার জবাবি আক্রমণে নেমে আসতে তারা ভীতি অনুভব করছিলো।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর বীরত্ব

বনি ইসরাইলের সেই সৈন্যদলে একজন নওজোয়ান ছিলেন। বাহ্যত সে কোনো আহামরি ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সুখ্যাতি ছিলো না। তিনি হলেন হযরত দাউদ আ.। শ্রুতি রয়েছে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যও তিনি আগমন করেন নি। বরং তাকে তাঁর পিতা ভাইদের ও ইসরাইলিদের অবস্থা জানতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে, জালুত প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের জন্য হুঙ্কার ছুঁড়ছে

আর তার জবাব দিতে গিয়ে ইসরাইলিদের পা কাঁপছে। ব্যাপারটি তার কাছে অসহনীয় ঠেকলো। তিনি তালুতের কাছে জালুতের উচিত জবাব দেয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তালুত বললেন, তুমি তো অনভিজ্ঞ যুবক। কাজেই তুমি তার মুখোমুখি হতে পারবে না। কিন্তু হযরত দাউদ আ. ছিলেন তার অনুমতি প্রার্থনায় অনড়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে হযরত তালুত তাকে অনুমতি প্রদান করলেন।

দাউদ আ. অগ্রসর হয়ে জালুতকে লক্ষ্য করে যুদ্ধের আহান জানালেন। জালুত দেখতে পেলো যে, তার সঙ্গে লড়াই করতে কমবয়স্ক একজন যুবক এসেছে। সে তাঁকে তুচ্ছ ভেবে কোনো পাত্তাই দিলো না। কিন্তু পরস্পরে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জালুত বুঝলো যে, দাউদ আসলেই প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। হযরত দাউদ আ. যুদ্ধরত অবস্থায় গাওফন[১] প্রস্তুত করলেন এবং নিশানা ঠিক করে পরপর তিনটি পাথর জালুতের কপালে ছুঁড়লেন। ফলে জালুতের মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। হযরত দাউদ আ. তখন এগিয়ে এসে তার মুণ্ডু ফেলে দিলেন। জালুত নিহত হতেই রণাঙ্গনের অবস্থা বদলে গেলো। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ইসরাইলিরা মরণপণ আক্রমণ করলো। অবশেষে তাগুতি বাহিনী পরাস্ত হলো। বনি ইসরাইলিরা বিজয়ীবেশে ফিরে এলো।

এ ঘটনার পর থেকে হযরত দাউদ আ.-এর বীরত্বগাথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষ সবার মনেই তার সীমাহীন শক্তির প্রভাব গেঁথে গেলো। সবার কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সবাইকে গুণমুগ্ধ করলো।

যদিও কুরআনুল কারিম গোটা বিবরণ নিষ্প্রয়োজন মনে করে উল্লেখ করে নি অথবা বাস্তবেই তা সঠিক নয়, তবে এ কথার ওপর কুরআন ও তাওরাত উভয় গ্রন্থই একমত যে, জালুতের হত্যাকারী হলেন হযরত দাউদ আ. এবং জালুতের হত্যাই বনি ইসরাইলের জন্য বিজয় ও সাফল্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[১]. গাওফন হলো গুলাল জাতীয় এক ধরনের যুদ্ধাস্ত্র। যা রশি দিয়ে বানানো হয়। এর মাঝে পাথর বা মাটির গুলি রেখে প্রতিপক্ষের দিকে ছোঁড়া হয়।

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

'তারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্য দান করো, আমাদের পা অবিচলিত রাখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। সুতরাং তারা আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে পরাজিত করলো; দাউদ জালুতকে সংহার করলো, আল্লাহ তাকে হিকমত ও রাজত্ব দান করলেন এবং তিনি যা ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।' [সূরা বাকারা : আয়াত ২৫০-২৫১]

কিছু কিছু ইসরাইলি বর্ণনায় এ কথা পাওয়া যায় যে, তালুত দেখতে পেলেন জালুতের ভীষণ শক্তিমত্তা দেখে বনি ইসরাইল তার মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছে না। তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করতে সক্ষম হবে, তার কাছে আমি আমার কন্যাকে বিয়ে দেবো এবং তাকে রাজত্বের একাংশ দান করবো। হযরত দাউদ আ. জালুতকে হত্যা করলে তালুত তার অঙ্গীকার পূরণ করে তাঁর সঙ্গে দাউদের কন্যার বিয়ে দিয়ে দেন এবং তাঁকে রাজত্বের অংশীদার বানিয়ে নেন।[১]

একটি ইসরাইলি রেওয়ায়েতের সমালোচনা

তাওরাতের স্যামুয়েল অধ্যায়ে তালুত ও দাউদ আ. সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ উপাখ্যান পাওয়া যায়। তার সারাংশ হলো, তালুত দাউদের বীরত্বোচিত কৃতিত্বের ফলে অঙ্গীকার পূরণ করে তাঁর কাছে তাঁর কন্যাকে বিয়ে দিলেও দাউদের প্রতি ইসরাইলিদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁর শক্তিমত্তাকে ভালো চোখে দেখতেন না। তাঁর প্রতি মনের ভেতর হিংসা ও ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছিলো। কিন্তু তিনি তা গোপনে লালন করতে থাকলেন এবং মনে মনে কৌশল খুঁজতে লাগলেন কীভাবে দাউদের গল্পের সমাপ্তি টানা যায়।

---

[১]. স্যামুয়েলের পুস্তিকা, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৮-৯

তালুতের কন্যা ও পুত্ররা এ সময় পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাউদের সহযোগী ও সহমর্মী ছিলেন। ফলে প্রতিটি কৌশলেই তালুতকে ব্যর্থ হতে হয়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি দাউদের প্রকাশ্য বৈরিতায় নেমে এলেন। এ অবস্থা দেখে দাউদ তার স্ত্রী ও শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা ফিলিস্তিনিদের একটি ছোট শহরে তালুতের এক শত্রুর ডেরায় আশ্রয় নিলেন। ইসরাইলিদের এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে শত্রুপক্ষ কাজে লাগালো। তারা সেনাভিযান চালিয়ে ইসরাইলিদের পরাজিত করলো।

ঘটনার এ পর্যায়ে সুদ্দির বর্ণনা ও তাওরাতের ভাষ্যে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাওরাতের বক্তব্য হলো, তালুত সেই যুদ্ধে নিহত হন। পক্ষান্তরে সুদ্দির বর্ণনা হলো, পরাজয় নিশ্চিত হতেই তালুত তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তখনকার শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ ও জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ মুহূর্তে যদি আমি তওবা করি, তাহলে কি সেটি কবুল হওয়ার কোনো সুযোগ রয়েছে? সবাই না বলেন। কিন্তু একজন ইবাদতকারী মহিলা 'হ্যাঁ' বলে তাঁকে আল-ইয়াসাআ নবীর মাজারে নিয়ে গেলেন এবং দোয়া করলেন। হযরত আল-ইয়াসাআ কবর থেকে উঠে তাঁকে বললেন, তোমার তওবার একটাই পথ রয়েছে : তুমি রাজত্ব দাউদের হাতে ছেড়ে দাও এবং তোমার বংশকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরিক হয়ে শহীদ হয়ে যাও। তালুত নির্দেশনা পালন করলেন। এভাবেই সম্পূর্ণ রাজত্ব হযরত দাউদ আ.-এর হাতে চলে এলো এবং তালুত তার বংশধরসহ শাহাদাতের সুধা পান করলেন।

উল্লিখিত বিবরণের আদ্যোপান্ত স্যামুয়েলের পুস্তিকা হতে সংগৃহীত। অথচ সুদ্দির উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিহাস লেখকগণ ওই ইসরাইলি বর্ণনাকে ইসলামি রেওয়ায়েতের মতো করে বর্ণনা করে থাকেন। এমনকি হযরত দাউদ আ.-এর যে মর্যাদা ও সম্মান সুরা বাকারায় এসেছে, তার তাফসিরে তারা এই ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন। আমার বুঝে আসে না যে, বিগত যুগে ইসরাইলি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বর্ণনার জন্য কেনো এত তোড়-জোড় সৃষ্টি হয়েছিলো যে, ইহুদিরা তাদের গোমরাহি ও বিভ্রান্তির সমর্থনে যে মনগড়া

কাহিনি রচনা করেছিলো সেগুলোকে কেনো ইসলামি তথ্য ভাণ্ডারে শামিল করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নি? ইতিহাস ও সিরাতের কিতাব না হয় অনেক পরের বিষয়, কুরআনের তাফসিরের মতো এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও এ ধরনের বানোয়াট রচনা থেকে সুরক্ষিত থাকতে দেয়া হয় নি। এখানেও সেই একই চিত্রের প্রকাশ ঘটেছে।

কুরআনুল কারিমের ভাষ্যেই আপনারা শুনেছেন যে, হযরত শামাবিল আ. বনি ইসরাইলের ক্রমাগত দাবির প্রেক্ষিতে তালুতকে বাদশাহ মনোনীত করলে বনি ইসরাইল আনুগত্য ও অধীনতার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তাঁকে বাদশাহ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলো। ফলে তারা বিকৃতির পথ অবলম্বন করেছিলো। কিন্তু খোদায়ি নিদর্শন তাদের নিরুত্তর করে ফেললে তারা বাধ্য হয়ে তালুতকে শাসক মেনে নিয়েছিলো। তখন ইহুদি পণ্ডিতেরা মনে মনে ভাবলো আমাদের অপরাধপ্রবণ মানসিকতা ও দুষ্ট বৈশিষ্ট্যের তালিকায় নতুন আরেকটি বিষয়ের সংযোজন ঘটতে যাচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর মনোনীত বান্দা তালুতকে অযোগ্য বানিয়ে শুরুতেই তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। কাজেই ইতিহাসে এমন কিছু কথা সংযোজন করতে হবে যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, শুরু থেকেই আমরা তালুতের ব্যাপারে যে 'শাসক হওয়ার অযোগ্যতা'-এর দাবি করেছিলাম, তা সত্য ও সঠিক। তখন আমরা দুনিয়ার সামনে এ কথা বলার সুযোগ পাবো যে, এগুলোই ওইসব ব্যাপার, যা আমরা আমাদের দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দিয়ে পূর্বেই অনুমান করে ফেলেছিলাম। অবশেষে তালুতের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হলো। দোষ হালকা করা এবং নিজেদের অপরাধপ্রবণ মানসিকতার ওপর পর্দা ফেলার কূটকৌশল হিসেবে তারা এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো। যার প্রকাশ ঘটেছে স্যামুয়েলের পুস্তিকায় তালুত ও হযরত দাউদ আ.-এর বিরোধ সম্পর্কিত উপাখ্যানে।

আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের কতিপয় সিরাত বিশেষজ্ঞ ও তাফসিরবিদও সেই বাস্তবতাকে উদ্‌ঘাটন না করে সরল মনে সিরাত ও তাফসিরের কিতাবে সেগুলোকে স্থান দিয়েছেন। তারা একটু খতিয়েও দেখলেন না যে, যে তালুতকে কুরআনুল কারিম আল্লাহর পক্ষ থেকে

মনোনীত অভিহিত করেছে এবং যাঁর বরকতে 'তাবুতে সাকিনা' বনি ইসরাইল দ্বিতীয়বার অর্জন করতে পেরেছে এবং 'তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন' বলে কুরআন যার জ্ঞান ও বীরত্বের প্রশংসা করেছে, এমন ব্যক্তিকে আমরা কীভাবে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ ও শক্ত দলিল ব্যতিরেকে ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের অধিকারী অভিহিত করে নিন্দা ও সমালোচনার পাত্র বানাতে পারি?

কুরআনুল কারিমের ক্ষেত্রে তো কোনোভাবে এ সন্দেহকে স্থান দেয়া যেতে পারে না যে, যে ব্যক্তির জীবনের দীর্ঘ সময় অপরাধে কেটেছে, যে ব্যক্তিগতভাবে দোষী, কুরআন তার প্রশংসা ও ফজিলত বর্ণনা করলো আর তার জীবনের অন্ধকার দিকগুলো গোপন করলো? কাজেই যখন কুরআনুল কারিম হযরত তালুতের জন্য প্রশংসাসূচক বাক্যের বাইরে একটিও নিন্দাজ্ঞাপক শব্দ ব্যক্ত করে নি, এমনকি এদিকে ইঙ্গিতও করে নি, তখন একজন মুসলমানের জন্য কী করে জায়েয হয় যে, সে তাওরাতের এই বানোয়াট গল্পকাহিনি মেনে নেবে? এটি কিছুতেই হতে পারে না।

এ কারণেই প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা ইবনে কাসির র. তাঁর ইতিহাসে এই বিবরণ পেশ করার পর মন্তব্য করেছেন—

وفي بعض هذا نظر ونكارة.

এই ঘটনার কিছু অংশ আপত্তিকর ও সংশয়পূর্ণ।

তিনি এ কথাও বলেছেন, এই ঘটনার এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, জনৈক নারী হযরত আল-ইয়াসাআ আ.-এর কবরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মৃত্যু থেকে জাগ্রত করেন। এ অংশটি এই ঘটনা মিথ্যা হওয়ার শক্ত দলিল। কারণ, একমাত্র নবী-রাসুলদের কাছ থেকেই এ ধরনের মুজেযা ঘটতে পারে, কোনো তাপসী ও আবেদা নারী থেকে নয়।[১]

এ কারণেই হযরত ইবনে কাসির রহ. তাঁর তাফসিরে এ ঘটনার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। সত্য হলো, এটি ভ্রূক্ষেপ করার মতোও নয়।

এ সময়ে হযরত শামাবিল আ.-এর ইন্তিকাল হয়।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯

শিক্ষা ও উপদেশ

হযরত শামাবিল আ. তালুত ও দাউদ আ.-এর উল্লিখিত ঘটনাপ্রবাহে অসংখ্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। তা থেকে সংক্ষেপে কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় তুলে ধরা হচ্ছে :

১. মহান আল্লাহ সকল জাতি ও গোষ্ঠীর মন-মানসিকতায় এ বৈশিষ্ট্য গেঁথে দিয়েছেন যে, যখন তাদের স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হয়, অন্যকোনো জাতি তাদেরকে দাসে পরিণত করার জন্য অত্যাচারের খড়্গ হাতে নেমে আসে তখন তারা নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ ও অত্যাচারীর প্রতিরোধে বিভেদ ভুলে ও বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ এক কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে। এ সময় তারা তাদের জন্য একজন সৎ ও যোগ্য নেতা খুঁজতে থাকে। উদ্দেশ্য হলো, তার হাত ধরে তারা অধঃপতনের গহর থেকে উঠে আসবে। এই চিরন্তন স্বভাবের প্রকাশ ঘটেছিলো বনি ইসরাইলিদের জীবনেও। হযরত শামাবিল আ.-এর শরণাপন্ন হয়ে তাদের জন্য একজন শাসক নির্বাচিত করে দেয়ার দাবিটি ছিলো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ।

২. স্বাধীনতা ও স্বাধিকার সংরক্ষণের এই চেতনা প্রথমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ও বিশেষ সদস্যদের মধ্যে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তা সাধারণ জনগণের মধ্যেও বিকশিত হতে শুরু করে। যে জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ সন্তানদের সংখ্যা যত বেশি সেই জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে এই চেতনা ততটা দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে।

৩. যখন কোনো জাতির বিশেষ সদস্যদের মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতা ও শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের চেতনা খুব দ্রুত উন্নতি করতে থাকে তখন সেটি ওই জাতির সাধারণ জনগণ বা অপেক্ষাকৃত কমবুদ্ধিসম্পন্ন সদস্যদের প্রভাবিত না করে পারে না। তখন তারাও এ কথা মনে করে যে, আমাদের মধ্যে জাতীয়তা সুরক্ষার যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে, তা ওই বিশেষ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু যখন ওই চেতনা ও অনুভূতি কর্মে বাস্তবায়িত করার সময়

হয়, তখন তাদের নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্বল কর্মপন্থার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

একটি চেতনাকে কর্মে বাস্তবায়িত করার এই ব্যাপারটি বাস্তবতার নিরিখে খুবই কণ্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর গিরিপথ। আদ্যোপান্ত একনিষ্ঠ ও লক্ষ্যে অবিচল না হলে এই বন্ধুর গিরিপিথ অতিক্রম করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এই সত্যকেই কুরআনুল কারিম নিম্নের শব্দে ব্যক্ত করেছে—

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

'অতঃপর যখন তাদের ওপর জিহাদ ফরয করে দেয়া হয়, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। আর আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৪৬]

৪. বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মন-মানসিকতায় যেসব জাহেলি প্রথা ও অপবিশ্বাস ছড়িয়ে আছে, তার একটি হলো, নেতৃত্ব ও শাসন করাকে একমাত্র ওই ব্যক্তিরই অধিকার মনে করা হয় যার বিত্ত ও ঐশ্বর্যর আছে। যার হাতে প্রচুর পুঁজি রয়েছে। বংশে-আভিজাত্যে যার অবস্থান উঁচুতে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ ধারণা এতটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে যে, যেসব জাতিগোষ্ঠীকে সভ্যতা ও কৃষ্টিতে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অগ্রসর মনে করা হয়, তারাও অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ চিন্তার অধিকারী জাতিসমূহের মতো এই বিভ্রান্ত প্রথার শিকার। বরং তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা এক কাঠি অগ্রসর হয়ে সেই অপবিশ্বাসকে দুষ্ট বুদ্ধি ও বাকচাতুর্যের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রয়াস চালায়। বনি ইসরাইলিদের মানসিকতাও এই ভুল বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিলো না। ফলে তারাও তালুতের নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেছিলো—

أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

'কী করে আমাদের ওপর তার রাজত্ব হবে অথচ আমরা তার চাইতে রাজত্বের অধিক যোগ্য এবং তাকে সম্পদের প্রাচুর্য দেয়া হয় নি।'

৫. কিন্তু ইসলাম এই অজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাসের বিপরীতে এ সত্যকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহর কাছে সম্পদ ও ঐশ্বর্য নেতৃত্ব ও শাসনের মাপকাঠি নয়, বংশ-বুনিয়াদের ওপর নেতৃত্ব নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে একমাত্র জ্ঞান ও শক্তিই মাপকাঠি হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা, নেতৃত্ব ও শাসনের সর্বপ্রথম শর্তই হলো, সততা, নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সুস্থ রায় দেয়ার ক্ষমতা। আর এগুলো সম্পদের প্রাচুর্য ও বংশের আভিজাত্য থেকে সৃষ্টি হয় না। বরং জ্ঞানই এগুলোর একমাত্র উৎস।

একইসঙ্গে নেতৃত্ব ও শাসনের জন্য বীরত্ব, সাহসিকতা ও সত্য প্রকাশের দৃঢ় চেতনাও প্রয়োজন। بسطة في الجسم : [দেহে সমৃদ্ধি] বলে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ভালো ভালো খাবার খেয়ে মেদবহুল শরীরের অধিকারী হয়েছে। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দেহের সেই শক্তি ও সামর্থ্য, যা জিহাদের ময়দানে শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় প্রতাপ ও প্রভাব সৃষ্টি করবে, প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার ঘটাবে।

কুরআনুল কারিম এ কথাও বলে দিয়েছে যে, নেতৃত্ব ও শাসনের অধিকারের এ মাসআলাটি ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং আবহমানকালের জাহেলি যুগের বিরুদ্ধে নবী-রাসুলদের মাধ্যমে জাতির সদস্যদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। যখনই তারা এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়, সঙ্গে সঙ্গে কোনো নবী বা রাসুল বা তাদের স্থলাভিষিক্তদের মাধ্যমে তাদের সেই বিভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয় এবং হেদায়েতের পথ দেখানো হয়। বনি ইসরাইল যখন হযরত শামাবিল আ.-এর সামনে তালুতের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ভুল যুক্তি উপস্থাপন করেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সজাগ করেছিলেন এ কথা বলে—

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর তালুতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।'

৬. যখন সত্য ও মিথ্যার সংঘাত হয় আর সত্যের পক্ষ থেকে আদ্যোপান্ত একনিষ্ঠ মুখলিসগণ জান কুরবানের চেতনা নিয়ে সত্যের সমর্থনে দাঁড়িয়ে

যান এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তখন দেখা যায় যে, সদস্যের স্বল্পতা তাদের বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃত বিচারে সদস্যসংখ্যার কম-বেশি হওয়া বিজয়ের নিয়ামক নয়। প্রায়শই স্বল্পতার কাছে আধিক্য পরাজিত হয়েছে। কুরআনুল কারিম এই সত্যেরই ঘোষণা দিয়েছে—

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'কত ক্ষুদ্র দল আল্লাহর নির্দেশে কত বৃহৎ দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে।'

contents

হযরত দাউদ
আলাইহিস সালাম

contents

বংশপরিচিতি

হযরত শামাবিল আ.-এর জীবনীর শেষের দিকে হযরত দাউদ আ.-এর ওপরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জালুতকে হত্যা করার ফলে তাঁর বীরত্বের গৌরবগাথা বনি ইসরাইলিদের হৃদয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এমন আসনে সমাসীন করেছিলো। তখন থেকেই তিনি জাতির উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আল্লাহর মহান নবী হিসেবে মনোনীত হন এবং বনি ইসরাইলের পথপ্রদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্বশীল হিসেবে 'খলিফা'-ও মনোনীত হন।

ইবনে কাসির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে হযরত দাউদ আ.-এর বংশপরিচিতি এভাবে তুলে ধরেছেন :

দাউদ বিন ইশা (ইশি) বিন আওবাদ বিন আবের (অথবা আবেয) বিন সালমূন বিন নাহশুন বিন আউনিয়াযাব (অথবা আমি নাযিব) বিন আরম (অথবা য়ারাম) বিন হাসরূন বিন ফারিস বিন ইয়াহুযা বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম। বন্ধনীর ভেতর যেসব নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ইবনে জারির থেকে বর্ণিত। সা'লাবি 'আরায়িসুল বয়ান' গ্রন্থে কিছু কিছু নামের স্থলে ভিন্ন নাম লিখেছেন। তবে এ কথার ওপর তাঁরা সবাই একমত যে, দাউদ আ. ছিলেন ইয়াহুযা বিন ইয়াকুব আ.-এর বংশধর।[১]

তাওরাতে এ কথা এসেছে যে, ইশা বা ইশির অনেকগুলো পুত্র ছিলো। হযরত দাউদ আ. তাদের সকলের কনিষ্ঠ।[২]

শারীরিক গড়ন-গঠন

ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ-এর বরাতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. হযরত দাউদ আ.-এর শারীরিক গড়ন-গঠনের এ বিবরণ দিয়েছেন যে, তিনি

---

[১]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/৯

[২]. স্যামুয়েলের কিতাব

ছিলেন কিছুটা খর্বাকৃতির। নীলাটে চোখ। শরীরে পশমের উপস্থিতি ছিলো অপেক্ষাকৃত কম। চেহারা ও অন্যান্য ত্বক থেকে আত্মিক পবিত্রতা ও মানসিক আভিজাত্য পরিস্ফুট হতো।[১]

কুরআনুল কারিমে হযরত দাউদ আ.-এর আলোচনা

কুরআনুল কারিমে হযরত দাউদ আ. সংক্রান্ত আলোচনা সুরা বাকারা, নিসা, মায়েদাহ, আনআম, ইসরা, আম্বিয়া, নামল, সাবা ও ছোয়াদে এসেছে। এ সুরাগুলোর ১৬ টি স্থানে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছু সুরায় সংক্ষেপে এবং কিছু সুরায় বিস্তারিতভাবে তাঁর জীবনী ও ঘটনাবলির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি কিভাবে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেছেন, তার ওপর আলোকপাত হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে নিম্নের ছকে বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

সুরা	আয়াত নং	সংখ্যা
বাকারা	১০২-২৫১	২
নিসা	১৬২	১
মায়েদা	৭৮	১
আনআম	৮৪-৯০	৭
ইসরা	৫৫	১
আম্বিয়া	৭৮ - ৮২	৫
নামল	১৫-৪৪	২৯
সাবা	১০-১৪	২
ছোয়াদ	১৭-২৬ ও ৩০-৪০	১৯
সর্বমোট		৬৭

নবুয়ত ও রিসালাত লাভ

হযরত দাউদ আ.-এর প্রতি বনি ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান ভালোবাসার ফলে তালুতের জীবদ্দশাতেই বা তার মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা হযরত দাউদ আ.-এর হাতে এসে যায়। এ সময় তাঁর ওপর আল্লাহর সবচেয়ে

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১০

বড় নেয়ামত ও পুরস্কার অবতীর্ণ হয় : তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতের মহাসম্মানেও ভূষিত করা হয়।

হযরত দাউদ আ.-এর পূর্বে বনি ইসরাইলে এ ধারাবাহিকতা চলে আসছিলো যে, শাসসক্ষমতা পেত এক বংশের লোক আর নবুয়ত ও রিসালাত পেতো অন্য বংশের লোক। সাধারণত ইয়াহুযার বংশে নবুওতের বাতি জ্বলতো আর ইফরাহিমের বংশের লোকেরা রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা পেতো। দাউদ আ. ছিলেন ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি, যাঁর মধ্যে উল্লিখিত দুটি নেয়ামতের সংযোগ ঘটেছিলো। তিনি মহান আল্লাহর নবী ও রসূলও ছিলেন এবং সিংহাসনেরও অধিকারী হয়েছিলেন। হযরত দাউদ আ.-এর এ মহাসম্মান ও মর্যাদা কুরআনুল কারিম এভাবে ব্যক্ত করেছে—

وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ

'আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তিনি তাকে যা ইচ্ছে শিখিয়েছেন।' [সুরা বাকারা]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

'হে দাউদ, নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার খলিফা বানিয়েছি।' [সুরা সাদ]

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

'আমি তাদের দু'জনকেই রাজত্ব ও জ্ঞান দান করেছি।' [সুরা আম্বিয়া]

নবী ও রাসুলদের মধ্য হতে হযরত আদম আ. ব্যতিরেকে হযরত দাউদ আ.-ই একমাত্র নবী যাকে কুরআনুল কারিম 'খলিফা' শব্দে আহ্বান করেছে।

কী কারণে হযরত দাউদ আ.-কে এ স্বতন্ত্র বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে? গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর দুটি কারণ বুঝে এসেছে। প্রথম কারণটি নিয়ে সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচনা করা হবে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, যখন বনি ইসরাইলের কয়েক শতাব্দী প্রাচীন প্রথা লঙ্ঘন করে হযরত দাউদ আ.-কে নবুয়ত ও রিসালাতের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হয় তখন আবশ্যক ছিলো তাকে এমন এক বিশেষণের মাধ্যমে

সম্বোধন করা, যা আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও ক্ষমতা উভয় গুণের পূর্ণ প্রকাশস্থল হওয়াকে ফুটিয়ে তুলবে। আর স্পষ্ট কথা হলো, এর জন্য ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'খলিফা' শব্দের চেয়ে অধিক যুৎসই দ্বিতীয় কোনো শব্দ হতে পারে না।

মোটকথা, হযরত দাউদ আ. বনি ইসরাইলের হেদায়েত তথা পথপ্রদর্শনের দায়িত্বও পালন করতেন এবং তাদের সামাজিক জীবনের তত্ত্বাবধানের কর্তব্যও আঞ্জাম দিতেন।

রাজত্বের বিশাল পরিধি

কুরআনুল কারিম, তাওরাত ও ইসরাইলি ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত দাউদ আ. ছিলেন বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সুস্থচিন্তা, কর্মকৌশল, সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা ইত্যাকার গুণাবলি বিবেচনায় একজন পূর্ণ মানুষ। বিজয় ও সাফল্য সবসময় তার পদচুম্বন করতো। তার ওপর মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা এতটাই প্রবল ছিলো যে, শত্রুদলের মোকাবিলায় তার দল যতই স্বল্প হোক না কেনো; বিজয়ের পতাকা সবসময় তার হাতেই উড্ডীন হতো। ফলে খুবই অল্প সময়ের ভেতর তিনি শামদেশ, ইরাক, ফিলিস্তিন ও পশ্চিম জর্ডানের সমস্ত এলাকার ওপর তাঁর শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আইলা [আকাবা উপসাগর] থেকে শুরু করে ফোরাতের সমস্ত এলাকা ও দামেশক পর্যন্ত গোটা অঞ্চল তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিলো। যদিও এতে হেজাযের সেই অংশগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, যা তার অঙ্গুলি হেলনের আজ্ঞাবহ প্রশাসনের অংশ হয়ে পড়েছিলো, তবুও এ কথা বলা কোনোভাবে অত্যুক্তি হবে না যে, হযরত দাউদ আ.-এর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কোনো অংশীদার ছাড়াই 'সামি জাতিসমূহ'-এর একক সাম্রাজ্য ছিলো। জাতির নতুন ইতিহাসদর্শন অনুযায়ী 'আরব জাতীয়তাবাদ' বা তার থেকে আরো ব্যাপক শব্দে 'সামি জাতিসমূহের ঐক্য'-এর প্রশাসন বলা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সৈন্যবহর এবং রাজত্বের বিশাল পরিধি ও বিস্তৃত সীমারেখার সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহর বিধান' কার্যকরের সৌভাগ্য তার বিশালতা, প্রতিপত্তি, প্রতাপ ও বড়ত্বকে অধিকতর উচ্চতা দান করেছিলো। এ রাজত্বে বসবাসকারী জনগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো যে, যদি হযরত দাউদ আ.-এর সামনে

কোনো মামলা বা তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উপস্থাপন করা হয় যা খুবই জটিল বা মিথ্যাচারপূর্ণ, তবুও তিনি 'আল্লাহর ওহি'-এর মাধ্যমে সেটির মূল অবস্থা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবেন। এ কারণে মানুষ বা জিন, কারোরই এ দুঃসাহস হতো না যে, তার আদেশ অমান্য করবে। ইবনে জারির তার ইতিহাসগ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, একবার দু-ব্যক্তি একটি ষাঁড়ের মালিকানার বিবাদ নিয়ে হযরত দাউদ আ.-এর খেদমতে হাজির হলো। তাদের দু-জনের প্রত্যেকেই বলছিলো যে, আমিই এর মালিক, অপরজন আত্মসাৎ করতে চাইছে। হযরত দাউদ আ. মামলার ফয়সালা পরদিন পর্যন্ত মুলতবি করলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি বাদীকে বললেন, রাতে আমার কাছে আল্লাহর ওহি এসেছে যে, তোমাকে হত্যা করা হোক। কাজেই তুমি সত্যি কথা বলো। বাদী স্বীকারোক্তি দিয়ে বললো, হে আল্লাহর সত্য নবী, এ মামলায় আমার দাবি শতভাগ সত্য ও সঠিক। কিন্তু এ ঘটনার পূর্বে আমি এ বিবাদীর পিতাকে ধোঁকা দিয়ে মেরে ফেলেছিলাম। স্বীকারোক্তি শুনে হযরত দাউদ আ. তাকে কিসাসস্বরূপ হত্যার নির্দেশ দিলেন।[১]

এ ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটতো। ফলে হযরত দাউদ আ.-এর বিধান এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপের সামনে সবাই ছিলো অনুগত। কুরআনুল কারিমের নিম্নের আয়াতে হযরত দাউদ আ.-এর বিশাল রাজত্ব এবং প্রজ্ঞা ও রিসালাতের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে—

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

'আমি তার সম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।'[সুরা সাদ : আয়াত ২০]

এই আয়াতে ও পেছনে অন্যান্য আয়াতে যে 'হিকমত' শব্দ এসেছে, তার দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এটি মুফাসসিরিনে কেরামের বহুল আলোচিত প্রশ্ন। মহান পূর্বসূরিদের বিভিন্ন বক্তব্যের সারাংশ হিসেবে আমি মনে করি, এখানে 'হিকমত' দ্বারা দুটি কথা উদ্দেশ্য। একটি হলো, নবুয়ত। আর দ্বিতীয়টি হলো, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সেই অত্যুচ্চ সিংহাসন, যার ওপর

---

[১]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/১২

অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি সঠিক পথের স্থলে কখনই কোনো বক্র পথ অবলম্বন করতে পারে না। কতিপয় আলেম এখানে 'হিকমত' দ্বারা যাবুর উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

তদ্রূপ فَصْلَ الْخِطَابِ [ফয়সালাকারী বাগ্মিতা] দ্বারাও দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

১. তিনি বক্তৃতা ও ভাষণে পারঙ্গম ছিলেন। এমনভাবে কথা বলতেন যে, প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি বাক্য ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হতো ও স্পষ্টভাবে বুঝে আসতো। তাতে কথায় বিশুদ্ধতা, সৌন্দর্য ও অলঙ্কার সৃষ্টি হতো।

২. তাঁর বিধান ও সিদ্ধান্ত সত্য-মিথ্যার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারীর ভূমিকা রাখতো।

যাবুর

বনি ইসরাইলের হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের 'মূল ও বুনিয়াদি গ্রন্থ' ছিলো তাওরাত। তবে চলমান অবস্থা, সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ ও যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে হযরত দাউদ আ.-কেও আল্লাহর পক্ষ থেকে 'যাবুর' প্রদান করা হয়। যা তাওরাতের বিধানাবলি ও মূলনীতিসমূহের অধীনে থেকে ইসরাইলি গোষ্ঠীগুলোকে সত্যের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছিলো। যার মাধ্যমে হযরত দাউদ আ. হযরত মুসা আ.-এর শরিয়তকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইসরাইলিদেরকে সত্যপথে পরিচালিত করেন এবং ওহির নুরের সুধায় আল্লাহর পরিচয় অন্বেষীদের পরিতৃপ্ত করেন।

যাবুর ছিলো আল্লাহর প্রশংসাগীতে পরিপূর্ণ। হযরত দাউদ আ.-কে মহান আল্লাহ এমন কণ্ঠস্বর ও যাদুময়ী সুর দান করেছিলেন যে, যখন তিনি যাবুর তেলাওয়াত করতেন তখন জিন ও মানব; এমনকি জীব-জন্তু পর্যন্ত সম্মোহিত হয়ে পড়তো। ফলে আজ পর্যন্ত 'দাউদি কণ্ঠস্বর' একটি প্রবাদ বাক্য।

মুসান্নাফে আবদির রায্যাকে রয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর সুকণ্ঠ শুনতেন,

তখন বলতেন, 'আবু মুসা আশআরিকে মহান আল্লাহ দাউদি কণ্ঠ প্রদান করেছেন।'[১]

অভিধানে যাবুর অর্থ অংশ ও টুকরো। যেহেতু এ কিতাবটি প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের পূর্ণতা দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো। এটি তারই অংশ বা টুকরো।

যাবুর ছিলো এমন কিছু ছন্দ ও অন্ত্যমিলযুক্ত বাণীর সংকলন, যাতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণগান এবং বান্দার অক্ষমতা, দাসত্বের স্বীকারোক্তি, উপদেশ ও নসিহত, শিক্ষা ও হিতোপদেশ সম্বলিত আলোচনা ছিলো। মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'রমযান মাসে যাবুর অবতীর্ণ হয়। এটি ছিলো উপদেশ ও প্রজ্ঞা সম্বলিত গ্রন্থ'।[২] তাতে বেশ কিছু সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীও বিবৃত ছিলো। এ কারণেই মুফাসসিরিনে কেরাম একথা বলেছেন যে, নিম্নের আয়াতে যাবুরের যে ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুসংবাদের বাহক। তাঁরাই এর উদ্দেশ্য।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

'আর নিঃসন্দেহে আমি যাবুরে নসিহতের পর এ কথা বলেছি যে, আমার সৎ বান্দাগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।' [সুরা আম্বিয়া]

কুরআনুল কারিমের অসংখ্য স্থানে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুরকে 'আল্লাহর ওহি', 'আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ ঘোষণাও করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইলিরা জেনে-বুঝে আল্লাহর এ কিতাবগুলোতে বিকৃতি সাধন করেছে। স্থানে স্থানে নিজেদের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করেছে। যার কারণে বর্তমানে তার মূল কাঠামোর ওপর এমনভাবে আবরণ পড়ে গেছে যে, আসল ও জালের মধ্যে পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১১

[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১২

'আর কতিপয় ইহুদি এমন, যারা (তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল-এর) কথাগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃতি করেছে।' [সূরা বাকারা]

কাজেই তাওরাত ও ইঞ্জিলের বাইরে খোদ যাবুর তাদের সেই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান। বর্তমান যাবুরের অনেকগুলো অংশ রয়েছে। যেগুলোকে আহলে কিতাবদের পরিভাষায় مزبور [মাযবুর] বলা হয়।

কথিত আছে যে, এগুলোর সংখ্যা একশো পঞ্চাশটি। সেই অংশগুলোর ওপর একেকটির একেক নাম। এই ভিন্ন নামধারী অজস্র খণ্ডের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে হযরত দাউদ আ.-এর ওপর অবতীর্ণ মাযবুর নয়। কেননা, কয়েকটির ওপর হযরত দাউদের নাম অঙ্কিত থাকলেও কয়েকটির ওপর অন্যদের নাম রয়েছে। যেমন, কোনোটির ওপর সংঙ্গীতজ্ঞরাজ কওরাহ-এর নাম, কয়েকটির ওপর শাওশিনাম-এর শিরোনামে আসিফের এবং কয়েকটির ওপর গুতাইতের নাম লেখা রয়েছে। এমন কিছু মাযবুরও রয়েছে, যার ওপর কারো নাম নেই। এ ছাড়া এমন কিছু মাযবুরও রয়েছে, যা হযরত দাউদ আ.-এর ইন্তিকালের কয়েক শতাব্দী পর সংকলিত হয়েছে। যেমন, এক মাযবুরে এ কথা রয়েছে—

'হে খোদা, বিভিন্ন জাতি তোমার উত্তরাধিকারে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা তোমার পবিত্র মন্দিরি আকৃতিকে অপবিত্র করে ফেলেছে। তারা জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।'[১]

বুখতেনাস্‌সার নামক অত্যাচারী রাজা বনি ইসরাইলের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো, মাযবুরে তার বিবরণ রয়েছে। অথচ ঘটনাটি ঘটেছিলো হযরত দাউদ আ.-এর কয়েক শতাব্দী পর।

মোটকথা, মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আ.-এর ওপর যাবুর নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে বনি ইসরাইলকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানান—

---

[১]. মাযবুর : ৭৯ থেকে ৮৪

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

'আর নিঃসন্দেহে আমি আম্বিয়াদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যাবুর দান করেছি।' [সূরা ইসরা]

وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

'আর আমি দাউদকে প্রদান করেছি যাবুর।' [সূরা নিসা]

বুখারি শরিফে 'আম্বিয়া' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ আ. গোটা যাবুর কিতাব এত অল্প সময়ে তেলাওয়াত করে ফেলতেন যে, যখন তিনি ঘোড়ার ওপর জিন টানতে শুরু করতেন তখন তেলাওয়াতও শুরু করতেন। দেখা যেতো টানাও শেষ, তেলাওয়াতও পূর্ণ।

হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে কুরআন ও তাওরাতের ভাষ্য

এখানে এসে কুরআনুল কারিম ও তাওরাতের ভাষ্যে চরম বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কুরআনুল কারিম হযরত দাউদ আ.-কে একাধারে প্রতাপ ও প্রতিপত্তির অধিকারী মহাসম্রাট এবং মহান নবী স্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে তাওরাতে তাকে শুধু 'কিং ডেভিড' বা রাজা দাউদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেখানে তার নবুয়ত ও রিসালাতের স্বীকৃতি নেই। আর বাস্তবতা হলো, তাওরাতের অস্বীকার অমূলক ও অবান্তর। বর্তমানের তাওরাত এতটাই মিথ্যাচার ও অপলাপে পরিপূর্ণ যে, খোদ তাওরাতের পৃষ্ঠাগুলোতেই তার অসংখ্য প্রমাণ জ্বলজ্বল করে।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা এমনিতেই সকল নবী-রাসুলকে বিশেষ মর্যাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তিনি তাঁর নবীদের অসংখ্য নেয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেছেন। এটি যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য যে, সম্মান ও মর্যাদার স্তর এক নয়। সম্মানের স্তরের ভিত্তিতে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁদের পরস্পরে স্তরগত তারতম্যও রয়েছে। এই স্বতন্ত্র স্তর ও মর্যাদাগত ভিন্নতা তাদের একেকজনকে অন্যদের থেকে স্বকীয়তা দান করেছে। ইরশাদ হয়েছে—

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

'তারা হলেন রাসুল, তাঁদের কতককে কতকের ওপর দান করেছি শ্রেষ্ঠত্ব।' [সুরা বাকারা]

হযরত দাউদ আ. সম্পর্কেও কুরআনুল কারিম কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেছে। বলেছে, মহান আল্লাহ তাঁর পূতঃপবিত্র রাসুলকে কোন স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করেছেন? তবে নবী-রাসুলদের সেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে বৈশিষ্ট্য বলতে মানতেকি 'খাস্সা' উদ্দেশ্য নয় যে, এই গুণ শুধু তার মধ্যেই সীমিত, অন্য কারো তার অস্তিত্ব বলতে নেই। বরং এখানে বৈশিষ্ট্য বলে উদ্দেশ্য হলো, তার সত্তার মধ্যে সেই বিশেষণটির এমন পূর্ণ ও সার্বিক প্রকাশ ঘটেছিলো যে, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলে সঙ্গে সঙ্গে মন সেই ব্যক্তিত্বের দিকে ছুটে যায়। যদিও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই বিশেষ বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্য নবীদের সত্তাতেও প্রকাশ পেয়েছিলো।

১. পাহাড়-পর্বত ও পশু-পাখির অনুগত হয়ে তসবিহ জপা

হযরত দাউদ আ. মহান আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠ ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় খুব বেশি লিপ্ত থাকতেন। তিনি এতটাই সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন যে, যখন তিনি যাবুর পাঠ করতেন বা আল্লাহ তসবিহ ও তাহলিল জপতেন, তখন তাঁর মায়াজালে কেবল মানবজাতিই সম্মোহিত হতো না, বরং মূক জীবজন্তু ও পক্ষিকুলও বিমোহিত হতো। তারা তখন তাঁর চতুর্পাশে একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর গুণগানের কোরাস সঙ্গীতে কণ্ঠ মেলাতো এবং হৃদয়ছোঁয়া সুরেলা কণ্ঠের প্রশংসাগীতে হযরত দাউদ আ.-এর সঙ্গী হতো। শুধু তাই নয়, পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসার গুঞ্জন তুলতো। হযরত দাউদ আ.-এর সেই মহান বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি কুরআনুল কারিম সুরা আম্বিয়া, সুরা সাবা ও সুরা সাদে স্পষ্টভাবে প্রদান করেছে। ইরশাদ হয়েছে—

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

'আর আমি পর্বত ও পক্ষিসমূহকে দাউদের বশীভূত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম।' [সূরা আম্বিয়া]

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ

'আর নিশ্চয়ই আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (তা হলো, আমি নির্দেশ করেছি) হে পাহাড় ও পাখি, তোমরা দাউদের সঙ্গে মিলে তাসবিহ ও পবিত্র বয়ান করো।' [সূরা সাবা]

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ () وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ

'নিশ্চয়ই আমি দাউদের জন্য পাহাড়কে অনুগত করে দিয়েছি যে, সে তার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা তসবিহ জপে। আর পক্ষিকুলকে করেছি সমবেত। তারা সকলেই ছিলো আল্লাহ-অভিমুখী।' [সূরা সাদ]

এই আয়াতসমূহের তাফসিরে কোনো কোনো মুফাসসির লিখেছেন, জীব-জন্তু, পশু-পাখি ও পাহাড়-পর্বত তাদের অবস্থার মধ্য দিয়ে তাসবিহ পাঠ করে। যেনো গোটা বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব ও সেগুলোর গড়ন-গঠন এমনকি তার অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। এগুলোই তাদের তাসবিহ ও প্রশংসাগান।

ফলের যদিও বলার মতো মুখ নেই। বাচনিক শক্তি থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু তার স্বাদ, ঘ্রাণ, সৌন্দর্য ও গুণাবলির প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা করে ঘোষণা দেয় যে, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ : সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!

ইমাম রাযি রহ. এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তাজ্জবের বিষয় হলো, তিনি এতো বড় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তার এই মতের প্রমাণে এমন কিছু দার্শনিক তত্ত্ব পেশ করেছেন, যা কুরআন, হাদিস ও যুক্তির বিচারে খুবই ঠুনকো। এমনকি সেগুলোকে দলিল বলাও ভুল হবে।[১]

[১]. উল্লিখিত আলোচনার ওপর অধিক জানতে অধ্যয়ন করুন তাফসিরে কাবির : ৫, সূরা বনি ইসরাইল।

এ বাস্তবতা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, কুরআনুল কারিমের দলিল পেশ করার ধরন কখনই এ জাতীয় দার্শনিক বাকচাতুর্যের অনুগামী নয়, যা ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। বিশেষ করে আপনি প্রথমে গ্রিক দর্শনের কল্পিত নীতির ওপর একটি কথা বলবেন আর এরপর কুরআনুল কারিমের স্বচ্ছ ও সরল ভাষ্যকে সেই কাঠামোতে ফেলার চেষ্টা করবেন, এটি কখনো কুরআনুল কারিম বরদাশ্‌ত করতে পারে না।

উল্লিখিত ব্যাখ্যার বিপরীতে সত্যিকারের গবেষক ও বিশ্লেষকদের বক্তব্য হলো, জীব-জন্তু, উদ্ভিজ্জগৎ ও জড় পদার্থ বাস্তবেই মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। সেগুলোর তাসবিহ পাঠ করার অর্থ এ নয় যে, সেগুলো নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্যের প্রমাণ দেয় আর এটাই তাদের তাসবিহ পাঠ। কারণ, কুরআনুল কারিম সুরা বনি ইসরাইলে পরিষ্কার ঘোষণা করেছে—

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

'সাত আসমান ও জমিন এবং সেগুলোর মধ্যকার প্রত্যেকেই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। এমন কোনো বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসায় তাসবিহ জপে না। তবে তোমরা সেগুলোর তাসবিহ বোঝো না।' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৪৪]

এখানে পরিষ্কারভাবে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। ১. সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে। ২. জিন ও মানব জাতি সেগুলোর তাসবিহ বোঝার শক্তি রাখে না। এখানে যখন মহান আল্লাহ নিজেই আসমান-জমিনসহ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু জীবজন্তু, উদ্ভিজ্জগৎ ও জড়পদার্থের দিকে তাসবিহ ক্রিয়াকে সম্বন্ধিত করেছেন, তাহলে অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, এ সকল বস্তুর মধ্যে তাসবিহের প্রকৃত অস্তিত্ব বিদ্যমান। এবং দ্বিতীয় বাক্যকে এর ওপর প্রয়োগ করা হবে যে, জিন ও মানব জাতি সেগুলোর তাসবিহ বুঝতে অক্ষম।

এখন যদি আপনি এখানে তাসবিহের প্রকৃত অর্থ না ধরে এ অর্থ করেন যে, সকল বস্তু নিজ নিজ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাসবিহ জপে, তাহলে

কুরআনুল কারিমের এ কথা কী করে সঠিক হবে যে, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ [তবে তোমরা সেগুলোর তাসবিহ বোঝো না।] কারণ, বিশ্বনিখিলের প্রতিটি অণু এক আল্লাহর গুণগান গায়। যদি কোনো নাস্তিকের তা বুঝে নাও আসে, তারপরও সকল ধর্মের সমস্ত আস্তিক বিশেষত প্রত্যেক মুসলমান সন্দেহাতীতভাবে তা বুঝবে। সে যখন আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবে তখন এ বিশ্বাসের সঙ্গেই ভাবে যে, বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বিন্দু সেই সত্তাকে মানে এবং এ জগতের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বই আল্লাহর অস্তিত্বের জানান দেয়। ইবনে হাযাম الفصل [আল ফসল] গ্রন্থে আলোচনার এ পর্যায়ে এসে একটি সন্দেহ উপস্থাপন করেছেন। তা হলো, যদি সমস্ত প্রাণিকুল, উদ্ভিজ্জগৎ ও জড়-পদার্থের তাসবিহ জপাকে সত্যিকারের তসবিহ মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ প্রশ্ন উঠবে যে, একজন নাস্তিক মানুষও তো شيء বা বস্তু কিন্তু সে তো এক মুহূর্তের জন্যও তাসবিহ জপে না। কাজেই উল্লিখিত আয়াতের সামগ্রিকতার শুদ্ধতা কিভাবে বাকি থাকে?

ইবনে হাযামের আপত্তি অগভীর। অবস্থাদৃষ্টে বুঝে আসে যে, এই সন্দেহ উপস্থাপন করার সময় তার দৃষ্টি থেকে কুরআনুল কারিমের ভাষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, যা এ পর্যায়ে দৃষ্টির সম্মুখে থাকতে হয়। তিনি আলোচ্য আয়াতের পূর্বাপরের ওপর গভীর চিন্তা করেন নি।

কুরআনুল কারিম উল্লিখিত আয়াতের পূর্বে মুশরিকদের আলোচনা করে মুসলমানদেরকে বলছিলো যে, মুশরিকরা তাদের বোধের বক্রতা ও অপরিপক্বতার কারণে আল্লাহর সঙ্গে অনেক বাতিল উপাস্যকে অংশীদার করে। কিন্তু কুরআন যখন তাদের সামনে তাদের কর্মকাণ্ডের অসারতা স্পষ্ট করে এবং বিভিন্নভাবে বোঝায় তখন তাদের ওপর সেই নসিহতের উল্টো প্রভাব পড়ে। তারা পূর্ব থেকে আরো বেশি ঘৃণা ঘৃণা করতে উদ্যত হয়। অথচ বাস্তবতা এটাই যে, আল্লাহ তাআলা ওই সকল বাতিল অংশীদার থেকে মহান ও পবিত্র, যা মুশরিকরা তাঁদের দিকে সংযুক্ত করে।

এরপর কুরআন বলে, একমাত্র মানবজাতি-ই এ জাতীয় শিরকসর্বস্ব বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। নয়তো সপ্ত আকাশ ও জমিনসহ গোটা

বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু এক আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করে। তারা কোনোভাবে শিরকে লিপ্ত নয়। তবে মানবজাতি তাদের তাসবিহের ভাষা বুঝতে অক্ষম। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বারংবার ক্ষমাকারী।

এরপর মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিণতি বাতলাতে গিয়ে কুরআন বলেছে যে, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন আমি তাঁর ও মুশরিকদের মধ্যে একটি আবরণ সৃষ্টি করি। অর্থাৎ তারা যখন কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার করে না, তখন তারা তাঁকে রাসুল বলেও মেনে নেয় না। যার পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় যে, তারা আপনার নসিহত থেকে মুখ ফিরিয়ে পরকালের ভয়াবহ ফলাফল থেকে নির্বিকার হয়ে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا () قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا () سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا () تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا () وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ()

'আর অবশ্যই আমি এ কুরআনে বহু বিষয় বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। বলো, 'যদি তাঁর সঙ্গে আরো ইলাহ থাকতো যেমন তারা বলে, তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় খুঁজতো। তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং সেগুলোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। তুমি যখন কুরআন পাঠ করো তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই।' [সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৪১-৪৫]

কুরআনুল কারিমের এই বিশদ আলোচনা ও পূর্বাপরের স্পষ্ট বক্তব্যের পর ইবনে হাযামের উল্লিখিত আপত্তি ও সংশয় পেশ করার সুযোগ থাকে না। কুরআন তো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করার দুঃসাহস একমাত্র মানুষই করতে পারে। কেননা, একমাত্র সে-ই হলো বৈপরীত্যপূর্ণ গুণাগুণের সম্মিলিত রূপ। তার বাইরে বিশ্বচরাচরের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর সামনে মূল বাস্তবতার বাইরে অন্য কিছু বলার সাহস রাখে না। এ কারণে তারা শুধু তারই পবিত্রতা স্বীকার করে। তাসবিহ ও তাহমিদই হলো তাদের একমাত্র গীত।

শায়খ বদরুদ্দিন আইনি রহ. গবেষক উলামায়ে কেরামের উল্লিখিত অভিমত সেই হাদিসের অধীনে সংক্ষেপে অথচ প্রামাণিক আকারে আলোচনা করেছেন, যেখানে দুই কবরের মৃত ব্যক্তিদের ওপর আযাব হওয়া এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গাছের একটি সবুজ ঢাল চিরে উভয় কবরের ওপর গেড়ে দেয়ার সময় বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ঢালগুলো শুকিয়ে না যাবে, তারা দু-জন আযাব থেকে বেঁচে থাকবে। তিনি বলেছেন—

'উলামায়ে কেরাম এই আয়াত وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ-এর এ অর্থ করেন যে, প্রতিটি জীবিত বস্তুই আল্লাহর গুণগান গায়। প্রতিটি বস্তু তার স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন লাভ করে। গাছের ডালে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ বাকি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সবুজ থাকে। শুকিয়ে যাওয়াটাই তার মৃত্যুর ঘোষণা। পাথরসহ জড় পদার্থের জীবন তা অক্ষত থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেগুলোর টুকরো টুকরো হওয়াটাই তার মৃত্যুর বার্তা। মুহাককিকদের এটাই অভিমত যে, উল্লিখিত আয়াতটি (কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়া) শর্তহীন ও সামগ্রিকতাব্যঞ্জক। তবে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, এ বস্তুগুলো কি বাস্তবেই তাসবিহ পাঠ করে না-কি নিজের অবস্থার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের জানান দেয়াটাই তার তাসবিহ?

এক্ষেত্রে গবেষক ও তাত্ত্বিকদের অভিমত হলো, এ বস্তুগুলো প্রকৃত অর্থেই তাসবিহ পাঠ করে। যখন 'মানববুদ্ধি'র বিচারে এটি অসম্ভব নয় এবং

শরিয়তের 'নস' (অকাট্য প্রমাণ)-ও স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করেছে তখন আবশ্যক হলো, তার সেই ব্যাখ্যাই দিতে হবে, যা গবেষকগণ বলেছেন।'[১]

কুরআনুল কারিমের 'নস'-এর স্পষ্ট বক্তব্য তো আপনার সামনেই আছে। কিন্তু 'মানববুদ্ধি'-এর বিবেচনায় সেটি কেনো অসম্ভব নয়, তার বিবরণ আপনি 'মানববুদ্ধি' থেকেই গ্রহণ করুন :

নাস্তিক বুদ্ধিজীবীরা এর ওপর একমত যে, কথাবার্তা ও কথনের জন্য 'বাক শক্তি' শর্ত নয়। যদি কোনো বস্তুর মধ্যে 'প্রাণ' ও 'শব্দ' বিদ্যমান থাকে তাহলে তার দিকে 'কথা'-কে সম্পৃক্ত করা নির্দ্বিধায় শুদ্ধ। গ্রীক দার্শনিকগণ প্রাণিজগতের ভেতর প্রাণের সঙ্গে ছোট ছোট বিষয় অনুভব করার শক্তি রয়েছে বলে স্বীকারও করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করেছে যে, উদ্ভিতের মধ্যেও 'প্রাণ' ও 'অনুভব' শক্তি উভয়টিই রয়েছে। এমনকি ছোট ছোট বিষয়ে পার্থক্য করার অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে। লজ্জাবতী গাছ হাতের স্পর্শ পেলে গুটিয়ে যায়। এরপর হাত থেকে আলাদা হলে পুনরায় নিজেকে প্রস্ফুটিত করে। মানুষখেকো গাছ মানুষ বা প্রাণী কাছে এলে তার অনুভব করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার গুল্মগুলো প্রসারিত করে সেটিকে পেঁচিয়ে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে। এগুলো প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। কলকাতায় প্রখ্যাত উদ্ভিত-বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর একটি বাগান আজো বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে মিস্টার বোস আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখান যে, একটি গাছ অসুস্থও হয়। আবার সুস্থতাও ফিরে পায়। কিছু গাছের প্রতি কিছু গাছের ঘৃণা করা— এটাও একটি প্রত্যক্ষ বিষয়। আবার কিছু গাছ কিছু গাছের প্রতি আকর্ষণও বোধ করে। এমনকি এখন কতিপয় বিজ্ঞানী এ দাবি তুলেছেন যে, জড়-পদার্থে খুবই দুর্বল ও অনুধাবনীয় নয় এমন প্রাণও পাওয়া যায়। যা-ই তাকে টিকিয়ে রাখে।

মোটকথা, প্রমাণ ও বুদ্ধি উভয়টির বিচারে কুরআনুল কারিমের এই ঘোষণা 'বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে' তা মূল অর্থের ওপর ঠিক থাকবে। এক্ষেত্রে 'অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকাশ' জাতীয় ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা নিরর্থক। তবে তাদের তাসবিহ ও প্রশংসার ধরনটি

---

[১]. উমদাতুল কারি শরহে বুখারি : ১/৮৭৪

মানুষের উপলব্ধির ঊর্ধে রাখা হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছে হলে কখনো কখনো নবী-রাসুলগণ তা উপলব্ধি করার সুযোগ পান, যা তাদেরকে মুজেযা হিসেবে প্রদান করা হয়। হযরত দাউদ আ.-এর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হতে এটিও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, যখন তিনি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতেন তখন জীব-জন্তু, পশু-পাখি ও পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একসঙ্গে আল্লাহর প্রশংসায় উদ্বেলিত হতো। হযরত দাউদ আ. ও অন্যরা একে অপরের তাসবিহ শুনতেন। হযরত দাউদ আ.-এর এই বৈশিষ্ট্য কুরআনুল কারিম সুরা আম্বিয়া, সুরা সাবা ও সুরা সাদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট থাকা দরকার যে, যেসকল হকপন্থী উলামায়ে কেরাম সুরা বনি ইসরাইলের আয়াতে জিন ও মানব জাতিদ্বয় ছাড়া অন্য বস্তুগুলোর তাসবিহ-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ' তারাও এক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, এখানে সেই অবস্থার প্রকাশ ঘটে নি। বরং সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং তার মাধ্যমে হযরত দাউদ আ.-এর একটি মুজেযার প্রকাশ হয়েছে। এখানে প্রাণিকুল ও পক্ষিকুল বাস্তবেই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করেছে ও তার গুণকীর্তন করেছে। যেমনটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিভিন্ন মুজেযার ক্ষেত্রে ঘটেছে। যেমন, কঙ্করের কালিমা পাঠ, উস্তুওয়ানে হান্নানার ক্রন্দন ও বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে আলাপচারিতা। এগুলোর প্রত্যেকটিই বাস্তব এবং তা প্রমাণিতও বটে।

লোহা হয়ে যায় কোমল

এত বিশাল ও প্রকাণ্ড রাজত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত দাউদ আ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এক রত্তিও গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজের জন্য বা পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার সরকারি খাজানার ওপর ফেলতেন না, বরং নিজ হাতে হালাল রুজি কামাই করতেন। এটাই ছিলো তাঁর জীবিকা। তাইতো হযরত দাউদ আ.-এর প্রশংসায় একটি বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يده. – بخاري، كتاب التجارة

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একজন ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম রিযিক হলো, তার হাতের উপার্জিত রিযিক। নিশ্চয়ই আল্লাহর মহান নবী দাউদ আ. নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করতেন।' [বুখারি শরিফ, কিতাবুত তিজারাহ]

শায়খ বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন, হযরত দাউদ আ. দোয়া করতেন, হে আল্লাহ, এমন কোনো উপায় বাতলে দিন, যেনো আমার জন্য হাতের কামাই সহজ হয়ে যায়। কেননা, আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর আমার জীবিকার বোঝা ফেলতে চাই না। আসলে হযরত দাউদ আ.-এর এই চেতনা ছিলো নবীসুলভ বৈশিষ্টাবলির একটি, যার কথা কুরআনুল কারিম মহান নবীদের হেদায়েত ও পথপ্রদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছে। প্রত্যেক নবী-ই যখন তাঁর উম্মতকে আল্লাহর পয়গাম শুনাতেন, তখন এ কথাও বলতেন—

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

'আর আমি তোমাদের থেকে এ খেদমতের কোনো বিনিময় চাই না; আমার বিনিময় তো আল্লাহর জিম্মায়।'[১]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, বুখারি শরিফের এ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, যদিও ইসলামের খলিফার জন্য বাইতুল মাল থেকে প্রয়োজন অনুপাতে ভাতা নেওয়া জায়েয আছে কিন্তু উত্তম এটাই যে, তার ওপর গলগ্রহ হবে না। এ কারণেই হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. খেলাফতকালে ভাতা হিসেবে যা গ্রহণ করেছিলেন, তার সমুদয় অর্থ ইন্তিকালের সময় ফেরত দিয়েছিলেন। অন্যান্য ইসলামি খেদমতের ওপর বিনিময় গ্রহণ করারও একই বিধান।[৩]

---

[১] উমদাতুল কারি : ৭/৪২০

[৩]. ফাতহুল বারি : ৪/২৪৩

হযরত দাউদ আ.-এর মনের একান্ত বাসনাকে মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন যে, তার হাতে লোহা ও ইস্পাতকে মোমের মতো নরম বানিয়ে দিয়েছিলেন। যখন তিনি লোহা বা ইস্পাত দিয়ে বর্ম বানাতেন তখন শক্ত পরিশ্রম বা কর্মকারের যন্ত্র ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছে গড়ে নিতে পারতেন। লোহা তাঁর হাতে মোমের মতো যেমন ইচ্ছে আকার ধারণ করতো।

কুরআনুল কারিম বিষয়টিকে সুরা আম্বিয়া ও সুরা সাবায় এভাবে উপস্থাপন করেছে—

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ () أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর আমি তার (দাউদের) জন্য লোহাকে নরম করেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করো এবং সৎকর্ম সম্পাদন করো। তোমরা যা কিছু করো, আমি তা দেখি।' [সুরা সাবা : ১০-১১]

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

'আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?' [সুরা আম্বিয়া]

তাওরাত ও 'লোহা ব্যবহারের ইতিহাস' থেকে জানা যায় যে, দাউদ আ.-এর পূর্বে লৌহশিল্প এতটুকু উন্নতি করেছিলো যে, ইস্পাত গলিয়ে বিভিন্ন টুকরো বানানো হতো। সেগুলোকে সংযুক্ত করে বর্ম তৈরি করা হতো। কিন্তু সেই বর্ম এতটাই ভারী হতো যে, খুব শক্তিশালী মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা ব্যবহার করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। আর তা পরিধান করার পর যুদ্ধের ময়দানে দ্রুত পদক্ষেপে চলাচল করা যেতো না।

হযরত দাউদ আ.-ই হলেন প্রথম ব্যক্তি যাঁকে মহান আল্লাহ এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, তিনি ওহির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এমন বর্ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হন যা হতো খুবই পাতলা। সেগুলো ছিলো ছোট ছোট শেকলের আংটা দিয়ে নির্মিত। হালকা ও নরম হওয়ার কারণে তা পরিধান করে একজন সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে খুব সহজেই চলাচল করতে

পারতো। শত্রু থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও সেই বর্ম কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিলো।

সাইয়িদ মাহমুদ আলুসি রহ. রুহুল মাআনিতে হযরত কাতাদাহ রহ. থেকে এ ধরনের রেওয়ায়েত নকল করেছেন।

পাখির সঙ্গে কথা বলা

হযরত দাউদ আ. ও তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান আ.-কে মহান আল্লাহ এ মহাসম্মান প্রদান করেছিলেন যে, তারা দু'জনই পাখিদের ভাষা জানতেন। যেভাবে একজন মানুষ অন্য মানুষের কথাবার্তা বুঝতে পারে, তদ্রূপ তাঁরাও পাখিদের কথাবার্তা বুঝতে পারতেন।

পাখিদের কথাবার্তা কী এবং হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম পাখিদের ভাষা সম্পর্কে কী ধরনের জ্ঞান রাখতেন, এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হযরত সুলাইমান আ.-এর জীবনীতে উল্লেখ করবো। তবে এতটুকু কথা নিশ্চিত প্রমাণিত যে, বর্তমান যুগের প্রাণীবিদগণ অনুমান ও ধারণানির্ভর জ্ঞান প্রয়োগ করে যে শাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন, বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে প্রাণিবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা মনে করা হয়, তাঁদের জ্ঞান ছিলো তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যা ছিলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর একটি বিশেষ দান।

যাবুর তেলাওয়াত

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, যখন হযরত দাউদ আ. ঘোড়ার ওপর জিন লাগাতে শুরু করে তা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ যাবুর তেলাওয়াত করে ফেলতেন। এটি ছিলো হযরত দাউদ আ.-এর জিহ্বার দ্রুত স্পন্দনের মুজিযার সঙ্গে সম্পর্কিত । যেনো মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আ.-এর জন্য সময়কে উল্লিখিত মেয়াদের ভেতর এমনভাবে প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, সাধারণ সময়ে যা হতো কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। অথবা তিনি তাঁকে দ্রুত শব্দ উচ্চারণের এমন শক্তি দান করেছিলেন যে, যে কথা বলতে অন্যদের কয়েক ঘণ্টা লাগতো, তা হযরত দাউদ আ. বুখারির বর্ণিত হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী মাত্র কয়েক মুহূর্তেই বলতে সক্ষম ছিলেন।

আর এ কথা আজো স্বীকৃত যে, দ্রুত স্পন্দনের জন্য কোনো সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যায় না।

হযরত দাউদ আ. ও দুটি গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরি স্থান

হযরত দাউদ আ.-এর জীবনের দুটি ঘটনা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেগুলো বাস্তবতার বিচারে এবং মুফাসসিরিনে কেরামের তাফসিরি আলোচনার প্রেক্ষিতে অত্যাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়। এর প্রথমটি যদিও মতানৈক্যপূর্ণ নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি এতটাই তর্কপূর্ণ যে, পণ্ডিতদের প্রবল যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের ফলে সেটি কোথেকে কোথায় চলে গেছে। সুতরাং এগুলোর মূল বাস্তবতা জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে ভুল বক্তব্যগুলোকে দলিল-প্রমাণের আলোকে খণ্ডন করতে হবে।

প্রথম স্থান

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ () فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

'আর স্মরণ করো দাউদ ও সুলাইমানকে যখন তারা একটি শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলো; তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিলো। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিলো। অতঃপর আমি সুলাইমানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৭৮-৭৯]

উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রা.-এর বরাতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত দাউদ আ.-এর খেদমতে দু-জন ব্যক্তি একটি মামলা নিয়ে হাজির হলো। বাদীপক্ষ তার আরজিতে এ কথা শুনালো যে, বিবাদীর বকরির পাল তার সমস্ত ক্ষেত বরবাদ করে ফেলেছে এবং সব শস্য নষ্ট করে ফেলেছে।

হযরত দাউদ আ. তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ রায় প্রদান করলেন যে, বাদীর ক্ষেতের ক্ষতির পরিমাণ বিবাদীর পশুপালের মূল্যের কাছাকাছি। তাই জরিমানা হিসেবে গোটা বকরির পাল বাদীকে দিয়ে দেয়া হবে। হযরত সুলাইমান আ.-এর বয়স তখন এগারো বছর। তিনি তাঁর পিতার কাছেই বসে ছিলেন। তিনি বললেন, যদিও আপনার এ রায় সঠিক কিন্তু এর থেকেও উত্তম পদ্ধতি এ হতে পারে যে, বিবাদীর গোটা পাল বাদীর হাতে অর্পণ করা হবে। সে তার দুধ ও পশম থেকে উপকার ভোগ করতে থাকবে। আর বিবাদীকে বলা হবে যে, সে এ সময়ের ভেতর বাদীর ক্ষেতে ফসল বুনবে। যখন ক্ষেতের উৎপাদিত ফসল পূর্বের অবস্থায় রূপান্তরিত হবে তখন ওই ক্ষেত বাদীকে ফিরিয়ে দেবে এবং সে নিজ পশুপাল নিয়ে ফিরে যাবে। হযরত দাউদ আ. পুত্রের এ ফয়সালায় খুবই প্রীত হলেন।

কুরআনুল কারিমও এ দিকে ইশারা করেছে যে, এই মামলায় হযরত সুলাইমান আ.-এর ফয়সালা ছিলো অধিক সঙ্গত। এই বিশেষ ঘটনায় হযরত দাউদের বিবেচনার ওপর হযরত সুলাইমানের বিবেচনা ছিলো অগ্রগামী।[১] ফিকহি পরিভাষায় হযরত দাউদের ফয়সালাকে বলা হবে 'কিয়াসি' আর হযরত সুলাইমানের ফয়সালাকে বলা হবে 'ইসতিহ্সানি'। কিন্তু এ ধরনের আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এ নয় যে, সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে হযরত সুলাইমান আ. তার পিতা হযরত দাউদ আ.-কে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কেননা, মহান আল্লাহ সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে হযরত দাউদ আ.-কে যে মর্যাদা প্রদান করেছিলেন, তা হযরত সুলাইমান আ.-এর অংশে আসে নি।

দ্বিতীয় স্থান

তাওরাত ও ইসরাইলি রেওয়ায়েতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তা হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পূতঃপবিত্র সত্তা ও গুণাবলির দিকে এমন কিছু হাস্যকর ও অনর্থক ঘটনা ও গল্প-কাহিনি জুড়ে দেয় যে, যেগুলো পড়লে এসকল মহান ব্যক্তিত্বকে নবী-রাসুল বিশ্বাস করা তো পরের কথা, চরিত্রবান ব্যক্তি বলে স্বীকার করতেও কষ্ট হয়।

---

[১]. তাফসিরে ইবনে কাসির, সুরা আম্বিয়া

মিথ্যাচারের বেসাতির দৃষ্টান্ত

মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট গল্প-কাহিনির একটির সম্পর্ক হযরত দাউদ আ.-কে জড়িয়ে। তাওরাতের স্যামুয়েল পুস্তিকায় হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে একটি লম্বা গল্প রয়েছে। সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

'আর সন্ধ্যাকালে দাউদ তার পালঙ্ক থেকে গাত্রোত্থান করে রাজমহলের ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন। ছাদের উপর থেকে তিনি এক অত্যন্ত রূপসী রমণীকে স্নান করতে দেখলেন। তখন দাউদ লোক পাঠিয়ে রমণীটির অবস্থা জানলেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, সে কি আলআমের কন্যা বিনতে সাবা নয়, যে হাত্তা আওরিয়্যাহ-এর স্ত্রী? দাউদ লোক পাঠিয়ে বিনতে সাবাকে ডেকে আনালেন। সে তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করলেন। (কেননা, রমণীটি তার ঋতুস্নান শেষে পবিত্র হয়েছিলো) এরপর তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আর এদিকে রমণীটি গর্ভবতী হয়ে পড়লো। তখন সে দাউদের কাছে সংবাদ পাঠালো যে, আমি গর্ভবতী হয়ে পড়েছি। ... প্রত্যূষে দাউদ ইউআবের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখলেন। পত্রটি তিনি আওরিয়্যাহ-র মাধ্যমে পাঠালো। তিনি চিঠিতে এ কথা লেখলেন যে, আওরিয়্যাহকে সংঘর্ষের সময় সবার সম্মুখে রাখবে এবং তুমি তার পাশ থেকে সরে যাবে যাতে সে মারা যায়।... আর ওই নগরীর লোকেরা বেরিয়ে এলো এবং ইউআবের সঙ্গে লড়াই করলো। ওখানে দাউদের স্বল্পসংখ্যক ভৃত্য কাজে এসেছে এবং হাত্তা আওরিয়্যাহ নিহত হয়। তখন ইউআব লোক মারফত যুদ্ধের বৃত্তান্ত দাউদকে জানিলে দিলো... আওরিয়্যাহ-এর স্ত্রী শুনতে পেলো যে, তার স্বামী আওরিয়্যাহ নিহত হয়েছে। সে তার স্বামীর জন্য বিলাপ করতে লাগলো। শোকের দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে দাউদ তাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর প্রাসাদে রেখে দিলেন। এভাবে সে তাঁর স্ত্রী হয়ে গেলো। তাঁর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দাউদের এই কাজে খোদা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন।'[২]

এই গল্পকথায় হযরত দাউদ আ.-এর যে চারিত্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা পড়ার পর তাকে নবী তো পরের কথা একজন শুদ্ধ চরিত্রসম্পন্ন মানুষও

মনে করা যায় না। অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া, তার সঙ্গে অবৈধ সঙ্গম করা, তারপর চক্রান্ত করে তার স্বামীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করানো–এগুলো মানবজীবনের এমনই ঘৃণ্য নাপাক কর্ম, যার জন্য শিষ্টাচার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'কুকাম' ছাড়া অন্যকোনো শব্দ প্রয়োগ করা যায় না।

سُبۡحٰنَكَ هٰذَا بُهۡتَانٌ عَظِيۡمٌ

'আপনি এর থেকে পবিত্র। এটি গুরুতর অপবাদ ছাড়া কিছু নয়।'

তাওরাতের পরস্পরবিরোধী বর্ণনা

আমরা হযরত দাউদ আ.-এর নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের ওপর আরোপিত অপবাদের প্রামাণিক খণ্ডন করার আগে তাওরাতের ভাষাতেই জানিয়ে দেবো যে, তাওরাত হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে অন্য অনেক জায়গায় কী বলেছে এবং তাঁর পবিত্রতা ও খোদাভীরুতাকে কীভাবে উল্লেখ করেছে।

তাওরাতের স্যামুয়েল অধ্যায়ে রয়েছে—

তখন নাতন (নবী) রাজা (দাউদ)-কে বললো, যাও যা তোমার ইচ্ছে করো। কেননা, খোদাওয়ান্দ তোমার সঙ্গে আছেন।

আর সে রাতে এমন ঘটলো যে, খোদাওয়ান্দের বাণী নাতনের কাছে পৌঁছলো—

যাও, আমার বান্দা দাউদকে বলো, খোদাওয়ান্দ একথা বলেছেন....।

সুতরাং এখন তুমি আমার বান্দা দাউদকে বলো, রাব্বুল আফওয়াজ (সব সৈনিকের প্রতিপালক) এ কথা বলেছেন, আমি তোমাকে মেঘপাল থেকে–যেখানে তুমি মেষের পেছনে পেছনে ঘুরতে–উঠিয়ে এনেছি যাতে তুমি আমার জাতি ইসরাইলের পথপ্রদর্শক হও।[১]

এসব বক্তব্য তাওরাত থেকেই নেয়া। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ আ. ছিলেন মহান আল্লাহর একজন প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা। তিনি সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার গৌরব লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর শরিয়তের পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য। তিনি ছিলেন কালিমামুক্ত,

---

[১]. স্যামুয়েল [২] অধ্যায় : ৭, আয়াত : ৩-৮

নিষ্কলুষ, পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহর দেয়া রাজত্বে তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের আমির ও আল্লাহর খলিফা। সবসময় ইলাহি রক্ষাকবচ তাঁকে সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। কাজেই তিনি ছিলেন মহান নবী ও প্রতাপশালী সম্রাট। কাজেই জানি না, আহলে কিতাবগণ কীভাবে তাওরাতের এই পরস্পরবিরোধী কথাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করবেন এবং হযরত দাউদ আ. তাদের চোখে কতটা মর্যাদাবান? যদি তাদের দৃষ্টিতে তিনি একজন নবী বা উত্তম চরিত্রবান হয়ে থাকেন তাহলে হাত্তা আওরিয়্যাহ-এর স্ত্রী সম্পর্কিত কাহিনি সম্পর্কে তাদের কাছে কী জবাব আছে? আর যদি আওরিয়্যাহ-এর স্ত্রীর ঘটনাটি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে উপরিউক্ত প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী দাউদ কোনজন?

এর বিপরীতে কুরআনুল কারিম হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত রাসুল ও একজন নিষ্পাপ নবী। তিনি ছিলেন আল্লাহর খলিফা ও বনি ইসরাইলের পরিচালক ও শাসক। কুরআন ঘোষণা করেছে—

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

'আমি তো কতক নবীকে কতক নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যাবুর দান করেছি।' [সুরা ইসরা : আয়াত ৫৫]

সুরা সাদে ইরশাদ করে—

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

'আমি দাউদকে সুলাইমান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিলো আল্লাহ-অভিমুখী।' [সুরা সাদ : ৩০]

সেখানে আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

'আমি তার সম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।' [সুরা সাদ : আয়াত ২০]

সুরা নামলে এসেছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

‘আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, ‘আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। [সূরা নামল : আয়াত ১৫]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুরআনুল কারিম যথারীতি পূর্বের কিতাবসমূহের সেই ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন ও সংশোধন করেছে, যা প্রবৃত্তিপূজারী জ্ঞানপাপীদের বিকৃতি ও পরিবর্তনের ফলে সেখানে আশ্রয় পেয়েছিলো এবং নিজ অনুসারীদের বিশ্বাসে স্থান পেয়েছিলো। কুরআনুল কারিম ইতিহাসের সেই অন্ধকার পর্দা ভেদ করে প্রমাণিত করেছে যে, হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম ছিলেন বনি ইসরাইলের মহান নবীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা ছিলেন আল্লাহর সত্য নবী। তারা ছিলেন সর্বপ্রকার গুনাহ ও কলুষ হতে মুক্ত। তাদের চরিত্রে আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কালিমা লেপন হয় নি।

কিন্তু আফসোস, হাজার আফসোস যে, কুরআনুল কারিমের ঘোষণা সত্ত্বেও হাত্তা আওরিয়্যাহর স্ত্রীর কল্পিত, অলীক ও উদ্ভট বানোয়াট কাহিনি তাওরাত ও ইসরাইলি রেওয়ায়েতের সূত্রে পেয়ে কতিপয় মুফাসসির কুরআনুল কারিমের তাফসিরে উদ্ধৃত করেছেন এবং ইসরাইলি মনগড়া গল্প-কাহিনিকে কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ ছাড়াই ইসলামি রেওয়ায়েতের সমান মর্যাদা দিয়েছেন!

ওইসকল সরল বুযুর্গ কেনো ভাবলেন না যে, যে কল্পিত কাহিনিগুলোকে আজ তারা ইসরাইলি রেওয়ায়েত হিসেবে কুরআনুল কারিমের তাফসিরে উদ্ধৃত করছেন, এ উম্মতের অনেকেই আগামীকাল সেগুলোকে কুরআনের আয়াতের তাফসির ও ব্যাখ্যা মনে করে ফেতনায় পড়ে যাবে। হতে পারে, তা তাদের গোমরাহির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাজ্জব! শত তাজ্জব আধুনিক ও প্রাচীন সেইসব আকায়িদশাস্ত্রবিশারদের প্রতি!! তারা এ জাতীয় উদ্ভট কল্প-কাহিনিকে শক্ত ভাষায় প্রত্যাখ্যান ও এ সকল মিথ্যা অপবাদকে খণ্ডণ না করে সেগুলোর জন্য কোনো ভালো প্রয়োগস্থল বের করে কবুল করে

নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং অপাত্রে সুধারণা পোষণের নীতি অবলম্বন করে রূঢ় সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছেন যে, ওই উদ্ভট কল্প-কাহিনিগুলোর ব্যাপারে তাঁরা যে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন, তার ফলে তারা ধীরে ধীরে একটি জটিল জালে আবদ্ধ হতে চলেছেন। কেননা, এগুলোকে কোনো-না-কোনোভাবে মেনে নেয়া হলে, ইসমতে আম্বিয়া তথা নবীগণের সত্তা নিষ্পাপ হওয়া-সংক্রান্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদি ইসলামি আকিদার ওপর আঘাত আসছে। যখন কুরআনুল কারিম তাঁদেরকে নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং এগুলোকে মিথ্যাচার অভিহিত করেছে, তখন কোন সাহসে তাঁদের দিকে এ মিথ্যা কাহিনিগুলো সম্বন্ধিত করা হয়? কার এমন দুঃসাহস যে, সে এগুলোকে কুরআনুল কারিমের তাফসিরে স্থান দেয়?

যাইহোক। এই মুফাসসিরগণ যে সকল আয়াতের তাফসিরে এই প্রাণঘাতী বিষ মিলিয়েছেন, তা সুরা সাদে হযরত দাউদ আ.-এর নিম্নের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ () إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ () إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ () قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ () فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ () يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ()

'তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসলো ইবাদতখানায়। এবং দাউদের নিকট পৌঁছলো, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ – আমাদের একে অপরের ওপর যুলুম করেছে;

অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন। এ ব্যক্তি আমার ভাই, তার আছে নিরানবইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, 'আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও', এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাউদ বললো, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরিকদের অনেকে একে অন্যের ওপর তো অবিচার করে থাকে– করে না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারলো, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো ও তাঁর অভিমুখী হলো। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়াল–খুশির অনুসরণ করো না, কেননা, এটি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে। [সুরা সাদ : আয়াত ২১-২৬]

আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা

এখানে হযরত দাউদ আ.-এর একটি পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে করা হয়েছে। হযরত দাউদ আ. প্রথমদিকে তা ধরতে পারেন নি কিন্তু হঠাৎ তার মনে এ খেয়াল এসেছে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। তখন তৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহর মনোনীত নবীদের মতো আল্লাহ-অভিমুখী হন এবং ইসতিগফার করেন। আল্লাহর দরবারে তার সেই ক্ষমাপ্রার্থনা গৃহীত হয়। ফলে তাঁর সম্মান ও আল্লাহর নৈকট্য পূর্বাপেক্ষা অধিক উচ্চতা লাভ করে।

ব্যাপারটি ছিলো শুধুই এতটুকু। কিন্তু যখন কতিপয় মুফাসসির লক্ষ্য করলেন যে, কুরআনুল কারিম সেই পরীক্ষার কোনো বিবরণ জানায় নি আর তাওরাত ও ইসরাইলি রেওয়ায়েতে আওরিয়্যাহ-এর স্ত্রীর একটি

চটকদার কাহিনি আছে; তাতে হযরত দাউদ আ.-এর ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ার কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন তারা পূর্বাপর না ভেবেই সেই মনগড়া গল্পকে ওই আয়াতের তাফসির বানিয়ে পরীক্ষা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও তার গৃহীত হওয়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

তাদের এ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত কাণ্ডকে বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণ ও গবেষকবৃন্দ কোনোভাবেই মেনে নেন নি। তারা দলিল-প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওই কল্প-কাহিনির সঙ্গে সুরা সাদের এ সকল আয়াতের তাফসিরের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। শুধু এটাই নয়, বরং এ পুরো গল্পটির আদ্যোপান্ত ইহুদিদের উর্বর মস্তিষ্কের প্রসব। ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারে এর কোনো স্থান হতে পারে না।

হাফেয ইমাদুদদিন ইবনে কাসির রহ. তার তাফসিরে লিখেছেন—

قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه.

'এ স্থানে কতিপয় মুফাসসির একটি গল্প উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে যার বৃহৎ অংশ ইসরাইলি বর্ণনা হতে সংগৃহীত। এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আনুগত্য-আবশ্যক একটি হাদিসও বর্ণিত নেই।'

তিনি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় আরো জোরের সঙ্গে বলেছেন—

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ههنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

'পূর্বের ও পরবর্তী সময়ের বেশ কয়েকজন তাফসিরকার এ স্থানে কয়েকটি গল্প ও কাহিনি বর্ণনা করেছেন। যার বৃহদাংশই ইহুদিদের কপোলকল্পিত। আর কিছু গল্প তো সন্দেহাতীতভাবে আদ্যোপান্ত মিথ্যাচার। যার কারণে

আমরা ইচ্ছেকৃতভাবে সেগুলোকে বর্ণনা করি নি। কুরআনুল কারিম যতটুকু ঘটনা জানিয়েছে, শুধু ততটুকুতেই আমরা যথেষ্ট মনে করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন।'

'কিতাবুল ফসল'-এ হাফেয আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযাম রহ. উল্লিখিত আয়াতের সূত্রে লিখেছেন—

ما حكاه الله تعالى عن داود قول صادق صحيح. لا يدل على شيئ مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولَّدها اليهود

'আর হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে কুরআন যে ঘটনা বর্ণনা করেছে তা সত্য ও সঠিক। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী বিদ্রূপকারীরা যে-রূপকথা বলে বেড়ায়, সেগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যেগুলো আদ্যোপান্ত ইহুদিদের বিকৃত মস্তিষ্কের তৈরি।'

তদ্রূপ খাফাজি রহ. 'নাসিমুর রিয়াদ'-এ, কাযি আয়ায রহ. 'শিফা'য়, আবু হাইয়ান উন্দুলুসি রহ. 'বাহরুল মুহিত'-এ, ইমাম রাযি রহ. 'আত-তাফসিরুল কাবির'-এ এবং এছাড়া অন্য মুহাক্কিকগণ তাঁদের কিতাবে এ সকল কল্প-কাহিনিকে প্রত্যাখ্যানযোগ্য অভিহিত করে প্রমাণ করেছেন যে, এক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো বিশদ বিবরণ বর্ণিত নেই।

আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা

এ সকল কল্পকাহিনিকে ঝেটিয়ে দূর করে মুহাককিকগণ উল্লিখিত আয়াতসমূহের এমন ব্যাখ্যা দান করেছেন, যা হয়তো সাহাবায়ে কেরামের বিশুদ্ধ বাণী ও মত হতে প্রাপ্ত অথবা কুরআনুল কারিমের পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য রেখে শুদ্ধ অভিরুচির মাধ্যমে নির্ণীত। তাই শুধু এগুলোই সহিহ এবং প্রণিধানযোগ্য।

১ম তাফসির

আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. বলেন, ঘটনা শুধু এতটুকুই যে, অকস্মাৎ দু-ব্যক্তি হযরত দাউদ আ.-এর ইবাদতগৃহে প্রবেশ করে। এ সময় সেখানে

হযরত দাউদ আ. ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেহেতু বাস্তবেই ওই দুই ব্যক্তি সমস্যায় ছিলো এবং তাদের দ্রুত সমাধানে উপনীত হওয়ার তাড়া ছিলো, এ কারণে তারা দেয়াল টপকে এসেছিলো। হযরত দাউদ আ. বাদীর বক্তব্য শোনার পর প্রথমে তাদের উদ্দেশে তিনি কিছু ওয়ায-নসিহত পেশ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, অবস্থা ভালো নেই। অধীনদের ওপর শক্তিশালীদের অত্যাচারের প্রবণতা সবসময় এমনই যে, তারা ওদের জীবনকে নিজেদের বিলাসিতার উপকরণ মনে করে থাকে। যা খুবই ধিক্কৃত। তবে আল্লাহর মুমিন বান্দাগণ যেহেতু নেককার হয়ে থাকেন, এ জন্য তারা নিজেদেরকে এ ধরনের জুলুম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং আল্লাহকে ভয় করেন। যদিও তাদের সংখ্যা অনেক কম।

এরপর হযরত দাউদ আ. তাদের মামলাটির একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান জানিয়ে বিবাদের অবসান ঘটান। যখন উভয় পক্ষ চলে যায় তখন হযরত দাউদ আ.-এর প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন হৃদয়ে এ কথা উদিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এত বিশাল সাম্রাজ্য ও দোর্দণ্ড ক্ষমতা দান করেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে এটি আমার জন্য অনেক বড় পরীক্ষা। এভাবে যে, মহান আল্লাহ আমাকে এত বিশাল সংখ্যক মানুষের ওপর যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব আমি কতটা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হই এবং খোদার এ নিয়ামতের আমি আমার ব্যবহারিক জীবনে কতটা শুকরিয়া আদায় করতে সমর্থ হই?

এই মানসিক ভাবনা হযরত দাউদের ওপর এতটাই প্রভাব ফেলে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে পড়েন এবং মাগফিরাত প্রার্থনা করে স্বীকারোক্তি প্রদান করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আপনার সহযোগিতা না থাকলে এই বিশাল দায়িত্ব যথাযথভাবে আমি কিছুতেই পালন করতে সমর্থ হতাম না। হযরত দাউদ আ.-এর এই মনোজাগতিক অবস্থা আল্লাহ তাআলার খুবই পছন্দ হলো এবং আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

ইবনে হাযাম রহ. উল্লিখিত তাফসির পেশ করার পর বলেন, মাগফিরাত আল্লাহর দরবারে এতটই প্রিয় আমল যে, তার পূর্বে গুনাহ থাকা জরুরি নয়। এমন নয় যে, প্রথমে গুনাহের কাজ করতে হবে আর এরপর সেই

কাজের বিপরীতে মেরুতে গিয়ে মাগফিরাত করতে হবে। কেননা, আল্লাহর ফেরেশতাগণ থেকেও মাগফিরাত চাওয়ার কথা প্রমাণিত রয়েছে। অথচ কুরআনুল কারিমের ঘোষণা হলো, ফেরেশতাগণ কখনই আল্লাহর অবাধ্য হন না। ইরশাদ হয়েছে—

لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

'তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন।' [সুরা তাহরিম : আয়াত ৬]

সেই কুরআনও কিন্তু ফেরেশতাদের ইসতিগফার করার কথা উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হয়েছে—

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

'এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন।' [সুরা আল-মুমিন : ৭]

ইবনে হাযাম রহ.-এর উল্লিখিত তাফসিরের সমর্থনে আমরা একথা যোগ করতে পারি যে, আলোচ্য ঘটনার কোথাও হযরত দাউদ আ. থেকে কোনো গুনাহ প্রকাশিত হওয়ার কথা উঠে নি। কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, 'আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।' আর পরীক্ষা নেয়া কোনো অপরাধ বা গুনাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া জরুরি নয়, যেমন হযরত আইয়ুব আ.-এর পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেছিলো। কাজেই হযরত দাউদ আ.-এর ব্যাপারটিও কোনো পাপ বা গুনাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং তিনি একজন নবীসুলভ দায়িত্বের অনুভূতি ও আল্লাহর দরবারে নিজ দাসত্ব ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন।

কুরআনুল কারিমের আলোচিত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা যদিও উল্লিখিত তাফসিরের সম্ভাবনা রাখে এবং এর দ্বারা হযরত দাউদ আ.-এর নবীসুলভ মাহাত্ম্য প্রতিফলিত হয়, তারপরও শেষ কথা হলো, এটি একটি

contents

ইজতিহাদি তাফসির। কারণ হলো, এখানে পরীক্ষার যে সুরতের কথা বলা হয়েছে, তা কোনো আয়াত বা কোনো হাদিসে উল্লেখ নেই। কাজে এর সম্পর্কও ইজতিহাদের সঙ্গে।

২য় তাফসির

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসিরে আবু মুসলিম রহ. বলেন, হযরত দাউদ আ.-এর সামনে যখন ওই দু-ব্যক্তি বাদী-বিবাদী হিসেবে নিজেদের মামলা পেশ করেন তখন হযরত দাউদ আ. বিবাদীকে উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়েই শুধু বাদীর বক্তব্য শুনে নিজের নসিহতে এমন কথা বলে ফেলেন, যার দ্বারা সার্বিকভাবে বাদীর কথার সমর্থন হয়ে যায়। যেহেতু এটি সাধারণত ন্যায়বিচার পরিপন্থী। এ কারণে হযরত দাউদ আ.-এর উল্লিখিত ইরশাদ যদিও নসিহতসুলভ ঢঙে প্রদত্ত ছিলো এবং এখনও মামলা থেকে সরে পড়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি, তারপরও এটি তার মতো একজন মহান নবীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। এটাই ছিলো সেই 'ফিতনা' হযরত দাউদ আ. যার শিকার হয়েছিলেন।

কিন্তু নিয়ম হলো, আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের কেউ যদি এ ধরনের বিচ্যুতির শিকার হন, তাহলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক বার্তা এসে যায়। এখানেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। হযরত দাউদ আ. চকিত সতর্ক হয়ে পড়েন যে, আলোচিত মামলায় ভুল হয়ে গেছে। যা তার জন্য পরীক্ষা। এজন্য তিনি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। যা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেন। এভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা আল্লাহর খুব পছন্দও হয়, যার কারণে তিনি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান পূর্বাপেক্ষা আরো বাড়িয়ে দেন।[১]

হযরত আবু মুসলিমের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সঙ্গে আমরা আরেকটু যোগ করবো। তা হলো, এসব কিছু ঘটে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-কে নসিহত করেন যে, দাউদ, তুমি পৃথিবীর সাধারণ রাজা-বাদশাহ ও বিচারকদের মতো নও। যারা অধিকাংশ সময় সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার পরোয়া না করে আল্লাহর সৃষ্টিজীবের ওপর শুধু মনের চাহিদা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে রাজত্ব করে বেড়ায়। তুমি

---

১. রুহুল মা'আনি : ২৩/১৬৮

আল্লাহর জমিনে তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ও খলিফা। তোমার পবিত্র জীবনের একমাত্র ব্রত সৃষ্টির সেবা করা। কাজেই তোমার দায়িত্ব হলো, প্রতিটি মুহূর্তে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটারও অবকাশ নেই। সিরাতে মুসতাকিমকেই তোমার রাজপথ জেনো। কুরআনুল কারিম উল্লিখিত বাস্তবতাকে বাঙময় করার জন্য উল্লিখিত আলোচিত আয়াতসমূহের পরেই নিম্নের ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছে।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি।'

এখানে আমরা দুটি সত্য তাফসির পেশ করলাম। এ দুই ব্যাখ্যার উভয়টিতেই মুফাসসিরগণ স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছেন যে, সেই মামলাটি কোনো কল্পিত ঘটনা নয়। বাস্তবেই এমনটি ঘটেছিলো। আগত দু-পক্ষই মানুষ ছিলেন। তারা কোনো ফেরেশতা ছিলেন না। কুরআনুল কারিমের প্রতি লক্ষ করলে এমনটিই মনে হয়।

আলোচিত আয়াতসমূহের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি যদিও ইজতিহাদপ্রসূত, তারপরও স্বীকার করতে হবে যে, আয়াতসমূহের পারস্পরিক মিল ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে উল্লিখিত ব্যাখ্যা খুবই জুৎসই হয়। এ কারণে মুফাসসিরগণের কাছে উল্লিখিত ব্যাখ্যা খুবই সমাদৃত।

কিন্তু উল্লিখিত ব্যাখ্যা দুটির প্রত্যেকটিতেই ভিন্ন ভিন্ন সংশয় থেকে যায়। যা ভেবে দেখার মতো। প্রথম ব্যাখ্যায় আয়াতসমূহের পারস্পরিক মিলের ওপর ভিত্তি করে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, ইবনে হাযাম রহ. যে কারণ দর্শিয়েছেন, যদি তা মেনে নেয়া হয় তাহলে পরবর্তী আয়াত يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ এর সঙ্গে আলোচিত আয়াতসমূহের কোনো সম্পর্ক ও মিল পরিলক্ষিত হয় না। এ ধরনের প্রেক্ষাপটে হযরত দাউদ আ.-এর এত বড় ফযিলত উল্লেখ করার কী অর্থ, যা কুরআনুল কারিমে হযরত আদম আ.-এর পর সমস্ত নবী-রাসুলদের মধ্য হতে একমাত্র তাঁকেই বলা হলো?

আর আবু মুসলিমের ব্যাখ্যায় এ সংশয় সৃষ্টি হয় যে, মামলা-মুকাদ্দমার ক্ষেত্রে দুনিয়ার সকল বিচারক ও শাসকদের সর্বস্বীকৃত নীতি হলো, অবশ্যই ফয়সালা করার পূর্বে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এটি একটি চূড়ান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। হযরত দাউদ আ.-এর মতো একজন সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নবীর ক্ষেত্রে এ কথা কীভাবে বিশ্বাস করে নেয়া যায় যে, তিনি বিবাদীর কথা না শুনেই বাদীর পক্ষে ফয়সালা করে দেবেন? অথবা নিজের মনের টান জানিয়ে দেবেন? এটি এমন কোনো সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় নয় যে, ঘটনাচক্রে হযরত দাউদ আ. তা ভুলে যাবেন এবং এক্ষেত্রে ভুল করে ফেলবেন।

কাজেই উল্লিখিত দুই ব্যাখ্যার বাইরে আমাদের মতে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো সেটাই, যা কথার গতি, আয়াতসমূহের পারস্পরিক মিল ও পূর্বাপরের সঙ্গে সামাঞ্জস্যের বিচারেও শুদ্ধ এবং যার বুনিয়াদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রা. হতে বর্ণিত একটি আসরের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩য় তাফসির

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত দাউদ আ. কাজ বণ্টন করে নিজস্ব দায়িত্বগুলো চারটি ভিন্ন ভিন্ন দিনে আলাদাভাবে আদায় করতেন। একদিন তিনি শুধু ইবাদতের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। একদিন তিনি রেখেছিলেন বিভিন্ন মামলা-মুকাদ্দমা নিরসনের জন্য। একদিন রেখেছিলেন ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য। আর একদিন রেখেছিলেন বনি ইসরাইলের হেদায়েত ও নসিহতের উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য উম্মুক্ত।[১]

কিন্তু দিনবণ্টনের এই বিবরণের মধ্য হতে সেই অংশটি ছিলো সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ যা তিনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। কেননা, এমনিতেই হযরত দাউদ আ.-এর কোনো একটি দিনও আল্লাহর ইবাদত হতে শূন্য হতো না। তারপরও তিনি বিশেষ একটি দিন শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন এবং সেদিন এ ছাড়া অন্যকোনো কাজই করতেন

---

১. রুহুল মা'আনি : ২৩/১৬২

না। কুরআনুল কারিম তাঁর এই গুণকে إِنَّهُ أَوَّابٌ [নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আল্লাহ-অভিমুখী] বলে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, কুরআনুল কারিম ও বনি ইসরাইলের ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, হযরত দাউদ আ. কামরা বন্ধ করে ইবাদত করতেন ও তাসবিহ জপতেন। যাতে কোনো ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। যেনো, বণ্টিত দিবসসমূহের মধ্য হতে এটিই একটি দিন, যেদিনে হযরত দাউদ আ.-এর কাছে কারো পৌঁছা দুঃসাধ্য ছিলো। এদিন তিনি বনি ইসরাইল থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন। অন্য দিনগুলোতে বিশেষ কোনো হাঙ্গামা দেখা দিলে রুটিনের বাইরেও হযরত দাউদ আ.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতো এবং তার কাছ থেকে নির্দেশনা পাওয়া যেতো।

এখন চিন্তার বিষয় হলো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করা একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা যেসকল ব্যক্তিত্বকে তাঁর সৃষ্টিজীবের হেদায়েতের জন্য, পথপ্রদর্শনের জন্য, সেবা করার জন্য নির্বাচিত করেছেন, তাদের কাছ থেকে 'ইবাদতের সংখ্যাধিক্য'-এর তুলনায় 'ফরয পালনে অত্যাধিক নিবিষ্টতা ও মনোযোগ' আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয়। তিনি এটাকেই সর্বাধিক ভালোবাসেন। নিঃসন্দেহে একজন সংসারত্যাগী সুফি সাধক আবেদ যে পরিমাণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে গিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হবে, তার বুযুর্গির স্তর তত বেশি উপরের দিকে উঠবে। নবুয়ত ও খেলাফতের দায়িত্ব এমন নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে এ পদ ও দায়িত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টিজীবকে পথ দেখানো ও তাদের সেবা করা। এ কারণে তাঁর বৈশিষ্ট্য হতে হবে, সৃষ্টিজীবের সঙ্গে সম্পর্ক ও বন্ধন কায়েম করে আল্লাহর বিধান কার্যকর করা। ঘরের কোণে পড়ে থেকে সুফি হওয়া এ দায়িত্বে কাম্য নয়।

এ কারণে হযরত দাউদ আ.-এর উল্লিখিত দিবসবণ্টনের ব্যাপারটি যদিও কাজের সুশৃঙ্খলার বিচারে সার্বিকভাবে প্রশংসনীয় ছিলো, কিন্তু সেখানে একটি দিনকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য এমনভাবে নির্দিষ্ট করে ফেলা যে, জনগণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, এটি নবুওতের মাকাম ও খেলাফতের দায়িত্বের পরিপন্থী ছিলো। যা হযরত দাউদ আ.-এর মতো

উচ্চ শ্রেণির নবী ও খলিফাতুল্লাহর জন্য কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। কারণ হলো, একজন জনবিচ্ছিন্ন দুনিয়াত্যাগী হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকার জন্য তাঁকে নবুয়ত দেয়া হয় নি, বরং এ পদ ও দায়িত্বের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিজীবের দীনি ও দুনিয়াবি সেবা করা ও সত্য পথে তাদেরকে পরিচালিত করতেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। যেনো তাঁর জীবনের ব্রত ছিলো সৃষ্টির সেবা ও পথপ্রদর্শন। 'ইবাদতের আধিক্য' তাঁর জীবনের প্রতীক ছিলো না। এ কারণে হযরত দাউদ আ.-এর উল্লিখিত পদক্ষেপ বন্ধ করতেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি পরীক্ষায় ফেলেছিলেন; এভাবে যে, দুই বিবদমান ব্যক্তি হযরত দাউদ আ.-এর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা দিনে কামরার দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। হযরত দাউদ আ. অকস্মাৎ দেখতে পান যে, তার সামনে রীতিবিরুদ্ধভাবে দু-জন ব্যক্তি দণ্ডায়মাণ, তখন তিনি স্বভাবতই ঘাবড়ে যান। যা অনুমান করতে পেরে তাদের দু-জনই নিবেদন করলেন যে, আপনি ভয় পাবেন না। আমাদের এভাবে আপনার সামনে চলে আসার কারণ হলো, এই মামলা। এক্ষেত্রে আমরা আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চাই। তখন হযরত দাউদ আ. তাদের কাছ থেকে গোটা বৃত্তান্ত শোনেন এবং নসিহত করেন।

মামলাটির সাধারণ বিষয়গুলো কুরআনুল কারিম এড়িয়ে গেছে। কেননা, যে কোনো বোধসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চিত বিশ্বাস করবেন যে, হযরত দাউদ আ. অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে কুরআনুল কারিম মামলাটির শুধু সে দিকটির ওপরই আলো ফেলেছে, যার সম্পর্ক 'রুশদ ও হেদায়েত'-এর সঙ্গে। অর্থাৎ, দুর্বলদের ওপর শক্তিমানদের জুলুম করা।

মোটকথা, উভয়পক্ষকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার পর হযরত দাউদ আ. সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে গেলেন যে, আমাকে আল্লাহ তাআলা এ পরীক্ষায় কেনো ফেলেছেন? তিনি তখন মূল বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরে আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন ও ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাআলা তার সেই ইসতিগফার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পূর্বের সম্মান ও মর্যাদাকে অধিকতর ও বহুবিধ উচ্চকিত করেন। অতঃপর নসিহত করেন যে, হে দাউদ, আমি তো তোমাকে পৃথিবীর বুকে আমার

'খলিফা' করে প্রেরণ করেছি। কাজেই তোমার দায়িত্ব হলো, আল্লাহর এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করা। আর এ কথা সবসময় মনে রাখবে যে, এ পথের বুনিয়াদি পাথেয় হলো, ন্যায় ও সুবিচার। কাজেই সিরাতে মুসতাকিম বা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কখনও বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হবে না।

৪র্থ তাফসির

কিয়াস, ইজতিহাদ অথবা সাহাবায়ে কেরামের আসার থেকে উদ্ভাবিত; এমন ব্যাখ্যার বাইরে একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ রয়েছে। যা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাকিম রহ. তার মুসতাদরাকে স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসির হিসেবে বর্ণিত। মুহাদ্দিসিনে কেরাম সে বর্ণনাটিকে সহিহ ও হাসান স্বীকার করেছেন। কাজেই নিঃসন্দেহে উপরের তিনটি ব্যাখ্যার ওপর এ ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হযরত দাউদ আ.-এর পরীক্ষার কথা আলোচনা করে বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর প্রিয় নবী দাউদ আ.-এর এই গর্বময় আচরণ পছন্দ হয় নি। ওহি এলো, হে দাউদ, যা-ই দেখতে পাচ্ছো, এসব হলো আমার সাহায্য ও আমার দয়া-করুণার ফসল। নয়তো তোমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যে সেই সামর্থ্য কোথায় যে, এই ব্যবস্থাপনার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে? কাজেই তুমি যখন এ দাবি করছো, তখন আমি তোমার পরীক্ষা নেবো। হযরত দাউদ আ. নিবেদন করলেন, হে পালনকর্তা, যদি এমনটি হয়, তাহলে আমাকে পূর্ব থেকেই জানিয়ে দেবেন। কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে হযরত দাউদ আ.-এর সেই দোয়া কবুল হয় নি। হযরত দাউদ আ.-কে এভাবে ফেতনায় ফেলে দেয়া হয়, যার কথা কুরআনুল কারিমে আলোচিত হয়েছে।[১]

অর্থাৎ হযরত দাউদ আ. সেই মামলায় ফয়সালা দেয়ার সময় তাসবিহ ও তাহলিল পাঠ করতে ভুলে গেলেন। আবার ঘটনাচক্রে সে সময় হযরত

---

[১]. মুসতাদরাক : ২/৪৩৩

দাউদ আ.-এর পরিবারের কোনো সদস্যও আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত ছিলো না।

উল্লিখিত তাফসিরের সারমর্ম এটাই অর্জিত হয় যে, দাউদ আ.-এর ব্যাপারটি ছিলো حسنات الأبرار سيئات المقربين [সাধারণ নেককারদের অনেক পুণ্যের কাজ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মহাত্মাদের জন্য গুনাহের কাজ বলে বিবেচিত হয়]-এর মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ। তা কোনো গুনাহের কাজ বা অপরাধমূলক কাণ্ড ছিলো না। তারপরও তা হযরত দাউদ আ.-এর মতো উচ্চশ্রেণির নবীর জন্য সঙ্গত ছিলো না। এ কারণেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা এসেছিলো।

মোটকথা, কুরআনুল কারিমের উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসির হিসেবে মুহাককিক উলামায়ে কেরাম যেসব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; একমাত্র সেগুলোই গ্রহণযোগ্য। অথবা কুরআনুল কারিমের মুখপাত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যে তাফসির বলেছেন, সেটাই প্রকৃত তাফসির। ইহুদিদের মস্তিষ্ক হতে যেসকল উদ্ভট গালগল্প উড়ে এসেছে, সেগুলোর সঙ্গে উল্লিখিত আয়াতসমূহের কোনো সম্পর্কই নেই।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর বয়স

প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা হযরত হাকিম রহ. তাঁর মুসতাদরাক কিতাবে একটি বর্ণনা নকল করেছেন, যার সারাংশ হলো, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ঊর্ধ্বজগতে যখন হযরত আদম আ.-এর ঔরস থেকে তাঁর সন্তানদেরকে বের করে তাঁর সামনে পেশ করা হয়, তখন তিনি একজন সুশ্রী, দীপ্তিময় কপালবিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে পরওয়ারদিগার, এ লোকটি কে? উত্তর এলো, তোমার সন্তানদের মধ্য হতে অনেক পরে আগম্য দাউদ। হযরত আদম আ. জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর জন্য কী পরিমাণ হায়াত রাখা হয়েছে? ইরশাদ হলো, ষাট বছর। হযরত আদম আ. নিবেদন করলেন, হে প্রভু, আমি আমার জীবনের চল্লিশ বছর এ যুবককে দিচ্ছি। এরপর যখন হযরত আদম আ.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি রুহ কবযকারী ফেরেশতাকে বললেন, এখনো তো

আমার জীবনের চল্লিশ বছর অবশিষ্ট আছে। ফেরেশতা বললেন, আপনি ভুলে গেছেন। আপনি এ পরিমাণ জীবনাংশ আপনার এক সন্তান দাউদকে দিয়েছেন।[১]

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে বুঝে আসে যে, হযরত দাউদ আ. একশো বছরের হায়াত পেয়েছিলেন। তাওরাতের 'সালাতিন' অধ্যায়ে রয়েছে যে, হযরত দাউদ আ. অতি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ইসরাইলিদের ওপর চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

'আর দাউদ বিন ঈশি সমগ্র ইসরাইলিদের ওপর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকাল ছিলো চল্লিশ বছর। তিনি জাবরুনে সাতবছর ও জেরুজালেমে পয়ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে, দৌলত ও সম্মানে পরিতৃপ্ত অবস্থায় পরলোকগমন করেন।'[২]

জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেন, হযরত দাউদ আ. সত্তর বছর রাজত্ব করেছিলেন।[৩] আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত দাউদ আ.-এর ইন্তিকাল হঠাৎ করে শনিবার হয়েছিলো। সেদিন তিনি নির্দিষ্ট ইবাদত করছিলেন। এ সময় একদল পাখি তাদের পরগুলো পরস্পরে বিযুক্ত করে মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছিলো। হঠাৎ এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪]

দাফন

তাওরাতে 'সালাতিন' অধ্যায়ে এসেছে, 'আর দাউদ তার পিতা ও পিতামহদের সঙ্গে শায়িত হন। তাঁকে 'দাউদের শহর' সাইহুনে সমাহিত করা হয়।'[৫]

---

১. মুসতাদরাক, খণ্ড : ২, ইতিহাস অধ্যায়
২. তাওয়ারিখ : অধ্যায় : ২৯, আয়াত : ২৬-২৮
৩. মুসতাদরাক : ২, ইতিহাস অধ্যায়
৪. ফয়যুল বারি : ২, আম্বিয়া অধ্যায়
৫. সালাতিন [১] : অধ্যায় : ২, আয়াত : ১১

শিক্ষা ও উপদেশ

হযরত দাউদ আ.-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলি ও বৃত্তান্ত আমাদের জন্য যেসব শিক্ষা ও উপদেশ পেশ করে, যা যদিও অতি ব্যাপক, তবু কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অমূল্য ফলাফল বিশেষভাবে মনোযোগের দাবি রাখে।

১. যখন মহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় ঈমানি চেতনাসম্পন্ন বানান এবং সেই ব্যক্তিকে বিশেষ ফযিলতে ভূষিত করেন, তখন তার প্রাকৃতিক দীপ্তিকে শুরু থেকেই জ্বলজ্বলে বানিয়ে দেন। তাঁর ভাগ্যের দ্যুতি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আলো ছড়াতে থাকে। হযরত দাউদ আ.-কে যখন আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় ঈমানি চেতনাসম্পন্ন নবী করেন তখন তার জীবনের প্রাথমিক যুগেই জালুতের মতো জালিম ও অত্যাচারী সম্রাটকে তাঁর হাতে হত্যা করিয়ে তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং তাঁর ঈমানি চেতনার সুদৃঢ়তা ও অবিচলতার দ্যুতি এমনভাবে প্রকাশিত করে দেন যে, সমস্ত বনি ইসরাইল একবাক্যে তাঁকে প্রিয় নেতা ও জনপ্রিয় পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেন।

২. অনেক সময় আমরা একটি জিনিসকে মামুলি মনে করি কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের পর স্পষ্ট হয় যে, সেটি অনেক মূল্যবান বস্তু। তাইতো দেখতে পাই যে, হযরত দাউদ আ.-এর শৈশবে আর তার মুজাহিদসুলভ সত্যপন্থী চেতনা ও আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গে হকের প্রতি দাওয়াত ও নবুওতের পদকে ভূষিত হওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। যা উল্লিখিত শিক্ষাকে আরো একবার প্রমাণিত করলো।

৩। সবসময় 'আল্লাহর খলিফা' আর 'তাগুতি সম্রাট'-এর মধ্যে এ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, প্রথমোক্তজন সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও প্রতাপের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিনয় ও বিনম্রতা এবং আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্তজন অহঙ্কার, আত্মমুগ্ধতা, বলপ্রয়োগ ও নিপীড়নের মূর্তপ্রতীক হয়ে থাকে। সে মনে করে, আল্লাহর সৃষ্টিজীব হলো তার সেবা ও বিলাসিতার যন্ত্র।

৪। আল্লাহর বিধান হলো, কোনো ব্যক্তি ইয্যত ও সম্মানের শিখড়ে উন্নীত হওয়ার পর যে পরিমাণ আল্লাহর শুকরিয়া ও তার অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি

দেবে, তাকে ওই পরিমাণ বেশির থেকে বেশি পুরস্কার ও মর্যাদায় সিক্ত করবেন। হযরত দাউদ আ.-এর গোটা জীবন ছিলো সেই বিধানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৫। ধর্ম ও মাযহাবের সম্পর্ক যদিও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বেশি, কিন্তু বস্তুজাগতিক শক্তি তথা খেলাফত তার জন্য অনেক বড় অভয়াশ্রম। অর্থাৎ ধর্ম ও মিল্লাত হলো দীনি ও দুনিয়াবি সংশোধনের চাবিকাঠি। আর খেলাফত ও শক্তি হলো তার-ই বাতলে দেওয়া সাম্যব্যবস্থার সংরক্ষক। হযরত উসমান রা.-এর বচনটি খুবই প্রসিদ্ধ : ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা একজন ক্ষমতাবান (খলিফা)-এর মাধ্যমে দীনি প্রতিরোধের সেই কাজ আদায় করিয়ে নেন, যা কুরআনুল কারিমের মাধ্যমেও অর্জিত হয় না।'[১]

৬। মহান আল্লাহ রাজত্ব ও ক্ষমতা প্রদানের জন্য কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াতে যা ইরশাদ করেছেন, তার সারকথা হলো, সর্বপ্রথম ব্যক্তির মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হতে হবে যে, রাজত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া ও নেওয়ার শক্তি একমাত্র আল্লাহর। দুনিয়ার বড় থেকে বড় রাজা-বাদশাহদের ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী—

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে আল্লাহ, তুমিই রাজ্য ও রাজত্বের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছে রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছে রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছে সম্মান দান করো এবং যাকে ইচ্ছে অপদস্থ করো। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।' [সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৬]

কিন্তু দান করা ও কেড়ে নেওয়ার একটি কানুন তিনি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যাকে 'সুন্নতুল্লাহ' [আল্লাহর রীতি] শব্দে ব্যক্ত করাই অধিক সঙ্গত। সেই কানুনটি হলো, কোনো জাতি রাজত্ব ও ক্ষমতা দু-ভাবে

---

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১

পেতে পারে। একটি হলো, 'আল্লাহর উত্তরাধিকার' জানা। অপরটি হলো, 'পার্থিব উপায়-উপকরণ' জানা। প্রথম সুরতে একটি জাতি তখুনি রাজত্বের অধিকারী হবে, যখন তার বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি আল্লাহর উত্তরাধিকার কাজ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার আকিদা-বিশ্বাসের সম্পর্কও ঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হতে হবে এবং তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডও সততা-কল্যাণের সেই স্তরে উন্নীত হতে হবে, যাকে কুরআনুল কারিমের পরিভাষায় صالحين-এর অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

সেই জাতি অবশ্যই আল্লাহর সেই পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার হকদার হবে, যাকে 'আল্লাহর শাসন' শব্দে ব্যক্ত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এটাই দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের প্রকাশ এবং এটাই নবী-রাসুলদের প্রকৃত উত্তরাধিকার। আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, কোনো জাতি যদি আকিদা ও আমলে নবী-রাসুলদের উত্তরাধিকারী হতে পারে তাহলে সে জমিনি উত্তরাধিকারেরও অধিকারী হবে। তার সেই অর্জনের পথে যদি পার্থিব উপায়-উপকরণের পাহাড় সমান বাধাও আসে, সেগুলোকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে হলেও আল্লাহ তার অঙ্গীকার পূরণ করে দেখাবেন। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

'আর আমি যাবুরে নসিহতের পর লিখে দিয়েছি যে, আমার নেককার বান্দাগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

'নিশ্চয়ই জমিন আল্লাহর। তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে তার উত্তরাধিকারী বানান।'

আল্লাহর অভিপ্রায়ের সিদ্ধান্ত এই যে, জমিনের উত্তরাধিকার তারাই পাবে যারা তার 'নেককার বান্দা' হবে। যদি কোনো জাতি বা উম্মতের মধ্যে এই যোগ্যতা না থাকে, তবে সে ইসলামের বড় দাবিদার হলেও জমিনি

উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারবে না। 'ইসলামি খেলাফত' তার অধিকার হবে না। এমন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য আল্লাহর কাছে কোনো অঙ্গীকারও থাকবে না।

তবে আল্লাহ তার নিজ প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতার বিচারে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাকে ইচ্ছে দিতে পারেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছে ছিনিয়ে নিতে পারেন। কারণ ও ফলাফলের মধ্যে যে সম্পর্ক, রাজত্ব দেওয়া-নেওয়ার উল্লিখিত মূলনীতির সঙ্গে তার কুদরতের সেই সম্পর্ক। সেই দেওয়া-নেওয়ার পেছনে তার অনেকগুলো প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতা কাজ করে, যার গভীরে পৌঁছা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যে চিত্রটি সবচেয়ে করুণ ও দুর্ভাগ্যজনক, তা হলো, মুসলমান 'গোলাম ও শাসিত' হবে আর কুফরি ও শিরকির ধ্বজাধারী সরকার তার ওপর 'প্রতাপশালী শাসনক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী' হবে। যেনো এটি আল্লাহর এমনই এক শাস্তি যা বদআমলের কারণে এবং সৎকাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলার ফলে মুসলমানদের ওপর আপতিত হয়।

এর থেকে যে শিক্ষা অর্জিত হয়, তা হলো, এখন যার হাতে কর্তৃত্ব আছে, সে এজন্য কর্তৃত্ব লাভ করে নি যে, আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট। বরং সে এ কারণে কর্তৃত্ব লাভ করেছে যে, জমিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণ তাদের বদআমলের কারণে উত্তরাধিকারের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে গোটা পৃথিবীর কল্যাণকামিতার দিকে তাকিয়ে কর্তৃত্ব এমন কাউকে দেয়া হয়েছে, যার জন্য মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়, কাফের-মুশরিক হওয়াও শর্ত নয়।

وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ

'আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার রাজত্ব দান করেন।'

এখন যদি মুসলমানগণ এর থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের বিপর্যস্ত জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে 'সালেহিন'-এর বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সমর্থ হয়, তাহলে আল্লাহর অঙ্গীকার নিজেই তাদেরকে সুসংবাদ জানাতে এগিয়ে আসবে। আল্লাহ বলেন—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

‘তোমাদের মধ্য হতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন।’ [সুরা আন-নুর : আয়াত ৫৫]

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত